পেরিয়ারের আত্ম-সম্মান আন্দোলন

সত্যাশ্রয়ী পি.কে. রায়

শান্তি সত্যভামা পাবলিকেশান ট্রাস্ট

পেরিয়ারের
আত্ম-সম্মান আন্দোলন

জন্ম : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯
মৃত্যু : ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩

সত্যাশ্রয়ী **পি.কে. রায়**
জাতীয় অধ্যক্ষ, আশাশ্রী

—ঃ প্রকাশন ঃ—
শান্তি সত্যভামা পাবলিকেশান ট্রাস্ট
প্রধান কার্যালয় ঃ—
বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Periyarer
ATMO-SAMMAN ANDOLON
Edited by : P. K. ROY (National President, ASASRI)
B. Com. (Hons), M. Com.,
PGD (Journalism),
PGD (Human Rights)

প্রথম প্রকাশ ঃ
১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পেরিয়ার রামস্বামীর ১৩৯-তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে

প্রচ্ছদ ঃ
সত্যাশ্রয়ী পূর্বাশা রায়, এ্যাডভোকেট

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা ঃ
সত্যাশ্রয়ী আরতি রায় (জাতীয় সহ-অধ্যক্ষা, আশাশ্রী)

অক্ষর বিন্যাস ঃ
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টিং
কলকাতা-৭০০০০৬

অনুদান মূল্য ঃ
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১. বংশীনগর, বগুলা, নদীয়া। ফোন ঃ ৮৫৩৫৮৭৩০৩০
২. সবুজ পল্লী, পাঁচপোতা, কলকাতা-১৫২। ফোন ঃ ৯৮৩১২৫৫৪১১
৯০০৭৬৯১৩৮৪

লেখকের স্বীকারোক্তি

থানথাই পেরিয়ার ইরোড ভেঙ্কট রামস্বামী নাইকার ভারতবর্ষের গণ আন্দোলন তথা আত্ম-সম্মান আন্দোলনের এক নির্ভীক যোদ্ধা। ভারতের নিপীড়িত, শোষিত শ্রেণী তথা মূলনিবাসীদের পেরিয়ার রামস্বামীর জীবনী ও তাঁর আত্ম-সম্মান আন্দোলন সম্পর্কে অবশ্যই অবগত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৯৫ সালের ১৪-ই এপ্রিল "সমাজ বিপ্লবী পেরিয়ার রামস্বামী" নামে বইখানি প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ চলছে। তিনি সারা জীবন ভারতবর্ষের বিভেদকামী, বর্ণ-বৈষম্য, জাতপাত ও স্বার্থবাদী ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় গ্রন্থের বিরুদ্ধে জেহাদ করে গেছেন। তিনি বেঁচেছিলেন সুস্থ্যভাবে ৯৪ বছর ৩ মাস ৬ দিন। এর মধ্যে ৮৪ বছর তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়ে যান। তাঁরই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে তামিলনাড়ুতে ৬৯% সংরক্ষণ চালু হয়। আজ ভারতের অন্য প্রান্তের মানুষ ভেলোরে চিকিৎসার জন্যে ছুটে যায়। সেখানকার চিকিৎসক কারা? ৬৯% সংরক্ষিত SC, ST এবং OBC-রা। আজ যারা সমাজ পরিবর্তন ও সমাজ বিপ্লবের কথা ভাবেন এবং মানুষের কাছে গিয়ে জাগরণের স্বপ্ন দেখান—তাদেরকে অতি অবশ্যই পেরিয়ারের বিপ্লবী জীবন ও তাঁর "আত্ম-সম্মান আন্দোলন" সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হতে হবে। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সমগ্র মূলনিবাসীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। তারা পাঠ করে যদি সমাজ আন্দোলনে তাদের উপকারে আসে, লেখক হিসাবে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো।

জয় মানুষ। জয় ভারত॥

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

যখন অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ভারতের দিকে দিকে জাগরিত হচ্ছে, তখন যারা চিরকাল ক্ষমতা থেকে বহুদূরে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে অবহেলিত, সমাজে যারা 'ছোটলোক' বলে ঘৃণিত—সেসব মানুষ ও জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতার মন্দিরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এবং সামাজিক অবহেলা ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিতে পশ্চিম ভারতে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, শাহুজী মহারাজ ও বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর ক্ষমতাধারীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তেমনি পূর্ব ভারতে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ এবং দক্ষিণ ভারতে নারায়ণ গুরুজী ও পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার। আপোষহীন এই মানুষটির তথা পেরিয়ারের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন কংগ্রেস ও মনুবাদীদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এ মহান নেতৃবৃন্দের মহা পরিনির্বাণের পর আন্দোলন থিতিয়ে আসে।

৮০-এর দশকে অবহেলিত মানুষের আন্দোলনের ঢেউ কাঁশীরামজীর বামসেফের মাধ্যমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৯৯৫ সালের ১৪-ই এপ্রিল প্রকাশ করতে পারি রামস্বামীর জীবন ও সংগ্রাম। বইটির নাম দিই "সমাজ বিপ্লবী পেরিয়ার রামস্বামী।"

তাঁর আরও অনেক লেখা আমি পাঠ করেছি।

পেরিয়ারের সংগ্রামী জীবনের প্রধান বিষয় ছিল "**আত্ম-সম্মান আন্দোলন**"। বহুদিন থেকে এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করার ইচ্ছা ছিল। কাজটি অবশ্য অনেক পূর্বেই করা হয়ে যায়। সেটাকে ঘঁষে-মেজে এবার প্রকাশিত হলো।

পেরিয়ারের জীবনী যারা পাঠ করেছেন, তাঁর "আত্মসম্মান আন্দোলন" পাঠ না করলে—তাঁর আন্দোলনের তেজস্বিতা সম্পর্কে অবজ্ঞাত হতে অনেকটাই পাঠকের বাকি থেকে যাবে।

কেননা, যে জাতি ও সমাজের আত্মসম্মান বোধ নেই, কিসে তাদের মঙ্গল-অমঙ্গল—সেই চেতনা বোধও নেই, তারা কিসের জন্যে আন্দোলন করবে?

পেরিয়ার মানুষকে সেই আত্মসমান বোধ জাগাতে দক্ষিণ ভারতের শহর

গ্রাম-গঞ্জে উদাত্ত কণ্ঠে **ব্রাহ্মণ্যবাদের মৃত্যুঘণ্টা** বাজানোর ডাক দেন।

ধর্মের নামে মিথ্যাচার করে যুগ যুগ ধরে ব্রাহ্মণরা যে কল্পিত দেবতা বানিয়ে, সেই দেবতার নামে অর্থ উপার্জনের রাস্তা তৈরি করে রেখেছে—পেরিয়ার তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি কল্পিত দেবতাদের নস্যাৎ করে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

"There is no god,
There is no god,
There is no god at all,
He, who invented god is a fool
He, who propagates god
is a scoundrel.
He, who worships god
is a barbarian."

ভারতের শূদ্র, অতিশূদ্র, অবহেলিত বহুজন তথা মূলনিবাসীদের আজ পেরিয়ারের দেখানো পথে **আত্মসম্মান** বোধ জাগানোর কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। **যে জাতির আত্মসম্মান বোধ নেই, সে জাতি কখনও বিচারধারার পরিবর্তন করতে পারে না।**

এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি বিশেষ প্রনিধান যোগ্য ঃ

"You can fool some of the people some of the time,
You can fool all the people some of the time,
But you can't fool all the people all the time."

পেরিয়ার আমৃত্যু জাত-পাত ও হিন্দুধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে ব্রেখট-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য :

"কিছু মানুষ আছেন, যারা একদিনের জন্যে সংগ্রাম করেন, তারা ভাল।
কিছু আছেন যারা এক বছরের জন্যে, তারা আরো ভাল।
আবার কিছু কয়েক বছরের জন্যে, তারা খুব ভাল।
কিন্তু যারা সারাজীবন সংগ্রাম করেন, তারা অপরিহার্য।"

ছাত্রজীবন

আজ ভারতের ইতিহাসে পেরিয়ার রামস্বামী একটি বিপ্লবের প্রতীক। ভারতবাসীর কাছে অজানা নয় যে, ১৯৫২ সালে তিনি "আত্মসম্মান" (Self-Respect) নামে একটি প্রগতিশীল ও গতিসম্পন্ন মহতী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। কিন্তু কেন তিনি এ আন্দালন সৃষ্টি করেছিলেন, সেটাই এখন আলোচিত হবে। তবে এ সকল বিষয় উত্থাপন করার পূর্বে পেরিয়ারের ছাত্র ও কর্মজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। তবেই একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে যে, এটা পেরিয়ার ঠিক, না ভুল করেছিলেন।

পেরিয়ারের ছেলেবেলায় চলে যাই। ঐ বয়সে তাঁর জাত-পাত ও ধর্ম সম্পর্কে কোন বোধগম্যি ছিল না। অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি এসব অনুসরণ করতেন না। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসব মানা বা পালন করার ভান করতেন। সত্যি কথা বলতে গেলে, ছেলেবেলা থেকে তাঁর ঈশ্বরে কোন বিশ্বাস বা ভক্তি ছিল না। যে কোন বিষয়ে তিনি যা করতেন—তাতে কখনই তিনি মনে করতেন না যে, ঈশ্বর রাগান্বিত হতে পারে।

পেরিয়ারের নিজের কথায়, "ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দেবে এ ভয়ে আমি কোন কাজ থেকে বিরত হতাম না। তাছাড়া আমি এমন কোন কাজই করিনি যে, এতে ঈশ্বর অখুশী হবে।"

তিনি স্মরণ করার চেষ্টা করতেন যে, তার কখনও ঈশ্বর বা ধর্ম বা জাত-পাতে সত্যিই বিশ্বাস ছিল কি না। পরবর্তীতে তিনি স্বীকার করেন, তিনি জানতেন না যে, এসবের ওপর তিনি কখন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, তার সঠিক দিনক্ষণও তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পেরিয়ারের বয়স যখন ছ'বছর, তখন তাঁকে একটা পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। এটা তাঁর জন্মভূমি ইরোড থেকে খুবই কাছাকাছি। স্কুলের চারপাশে কিছু জনবসতি ছিল।

এখানে কিছু 'ছেতিয়ার' ও 'তেলি' জাতির মানুষের বাস। তেলিদের জাতিগত ব্যবসা তেলের। অর্থাৎ তেলের ঘানি ছিল। এদের তেল কলগুলি সর্বক্ষণ চলত।

এছাড়াও আরো কিছু লোক পাশের উঁচু জায়গাটাতে বসবাস করত। এরা বাঁশ থেকে ঝুড়ি, কুলো ও চেটি বানাত। এ চেটি শব্দ থেকে তাদেরকে 'ছেতিয়ার'

জাতির লোক বলা হতো। এর সঙ্গে কিছু মুসলমানও বসবাস করত। বঙ্গদেশে এ ছেতিয়ারদের ডোম বা মুচি বলা হয়। এ ছেতিয়ার ও মুসলমানরা পাশাপাশি থাকত। (মুসলমান বলতে ধর্ম পরিবর্তিত মুসলমান)।

ঐ যুগে, অন্য জাতের লোকেরা ওদের বাড়ীতে কিছু খেত না।

পেরিয়ারকে স্কুলে পাঠানোর পূর্বে সাবধান করে দেয়া হয় যে, তিনি যেন ঐ সকল লোকদের সঙ্গে মেলামেশা না করেন। তাঁকে কঠোর ভাবে নিষেধাজ্ঞা করা হয় যে, তিনি যেন তাদের বাড়ীর কোন কিছু না খান। যদি নিতান্তই জল তেষ্টা পায়, তাহলে যেন শিক্ষক মশাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে জলপান করে আসেন। শিক্ষক মশাই ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান নিরামিষভোজী। তিনি জাতিতে ছিলেন "ওদুভার" (ওবিসি)।

পেরিয়ারকে প্রতিদিন তাঁর গৃহে এক বা দু'বার জলপান করতে যেতে হত। শিক্ষক মশাইয়ের বাড়ীতে একটি ছোট্ট মেয়ে একটা পেতলের ঘটি মাটিতে রাখত। তাতে জল দিত।

মেয়েটি বলতো—ঘটিটা যেন ঠোঁটে না ঠেকে। অর্থাৎ উঁচু করে জল খেতে। জল খাবার পর সে পেরিয়ারকে বলতো যে, ঘটিটা যেন উপুড় করে রাখা হয়। পেরিয়ার ঠিক সেভাবে রেখে দিত। এরপর মেয়েটি ঘটিটার ওপর জল ঢেলে দিয়ে উল্টে দিত এবং ভেতরটা ভাল করে ধুঁয়ে ফেলত এবং ঘটিটা নিয়ে ভেতরে চলে যেত।

পেরিয়ারের অভ্যেস ছিল ঘটিতে ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দিয়ে পান করা। কিন্তু উঁচু করে খাওয়ার ফলে জল পানের সময় গলার ভেতরে অল্প যেত এবং বাকিটা জামার ভেতরে ঢুকে যেত। কখনও সখনও জল নাকের ভেতরেও চলে যেত। এতে পিপাসা মিটত কিছুটা, তবে অস্বস্তি বেড়ে যেত।

এভাবে জলপান করতে গিয়ে অনেকটা জল পড়ে যেত এবং মাঝে মাঝে বিষম লাগত। ফলে মেয়েটি রেগে যেত। মেয়েটি ভাবত যে, পেরিয়ার ইচ্ছাকৃত ভাবে এসব করছে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আর কখনও শিক্ষক মশাইয়ের বাড়ীতে জল খেতে যাবে না। বরং ছেতিয়ার জাতির লোকদের বাড়ীতে যাবেন।

ছেতিয়ার জাতির ছাত্ররা কিন্তু কখনও ওদুভার জাতির শিক্ষকের বাড়ীতে জলপান করতে যেত না। ক্লাসে জল-পিপাসা পেলে তারা বুড়ো আঙ্গুল দেখাত।

শিক্ষক যাবার অনুমতি দিতেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে নির্দেশ দিতেন। তারা দৌঁড়ে বাড়ীতে গিয়ে জলপান করে ফিরে আসতো। যাদের বাড়ী দূরে—তারা কাছাকাছি কোন ছেতিয়ার জাতির বাড়ী থেকে জলপান করে আসত।

পেরিয়ার সিদ্ধান্ত নিল যে, তিনি এবার থেকে ছেতিয়ার জাতির ছেলেদের সঙ্গে যাবে এবং তাদের বাড়ীতেই জল পান করবেন।

পরের দিন। ক্লাসে একজন ছেতিয়ার ছাত্র বুড়ো আঙ্গুল দেখালো। পেরিয়ার তক্কে তক্কে ছিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুল দেখালো। শিক্ষক দু'জনকেই যাবার অনুমতি দিল। আর যায় কোথা! দু'জনেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

শিক্ষক ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পেরিয়ারকে ডাকলো এবং জিজ্ঞাসা করলেন : রামস্বামী কোথায় যাচ্ছ?

পেরিয়ার বললো : জল খেতে।

শিক্ষক : তুমি, ওর সঙ্গে যাচ্ছ?

রামস্বামী বুঝলো যে ঘোরতর অন্যায় কাজ হচ্ছে। সুতরাং, তিনি মাস্টার মশাইয়ের বাড়ীতেই জল খেতে গেলেন। ভেজা শরীরে ফিরে এলেন। জল খেতে গিয়ে গোটা শরীর ভিজে থপ্ থপ্ করছে।

তার পরনের ধূতিটাও বেশ ভিঁজে গেছে। তিনি চুপিসারে ক্লাসে বসে থাকেন। এদিনটা কোন ভাবে গেল।

তার পরের দিন। ক্লাস ঘরে বসে আজ তিনি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনি ছেতিয়ার ছাত্রের সঙ্গেই জল খেতে যাবেন। চিন্তা-ভাবনা আগেই ছিল। আজ তিনি সেই মত ব্যবস্থাও করে রেখেছেন।

আজ প্রথম ছাত্র পেরিয়ার উঠে দাঁড়ালো এবং তর্জনী অঙ্গুলিটি দেখালেন। অর্থাৎ তিনি হিসু করতে যাবেন। শিক্ষক মাথা নেড়ে অনুমতি দিলেন। রামস্বামী বেরিয়ে শিক্ষক মশাইয়ের বাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

যার সঙ্গে কথা হয়েছে, আগে থেকে সেই ছেতিয়ার ছাত্রটিও জল খাওয়ার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এলো। এবার দু'জনে মিলে সেই ছেতিয়ার ছাত্রটির বাড়ীতে গেল। সে রামস্বামীকে এক গ্লাস জল এনে দিল। অভ্যাস অনুযায়ী চুমুক দিয়ে তৃপ্তি সহকারে তিনি জলপান করলেন। আজ তাঁর কোন জামা-কাপড় ভিঁজলো না।

কিন্তু এ দৃশ্য দেখে গৃহকত্রী এগিয়ে এসে পেরিয়ারের কাছে জানতে চাইলো

যে, ছেতিয়ার বাড়ীতে জল পান করাতে তাঁকে কোন শাস্তি পেতে হবে না তো!

রামস্বামী উত্তরে জানায়, না।

তাঁর ঐ বন্ধুটির নাম ছিল পালানিয়াপ্পান। গৃহকর্ত্রী তাকে রামস্বামীর জল খাওয়া গ্লাসটিকে ধুয়ে দিতে বল্লেন। রামস্বামী দৌড়ে স্কুলে চলে গেলেন। বন্ধুটিও গ্লাস ধুয়ে একটু বাদে স্কুলে এলো। ছেতিয়ার বাড়ীর জল পান করে আজ তাঁর মনের জোর বেড়ে গেল।

রামস্বামী ঠিক করলেন। তিনি এবার ডোম বাড়ীতে জল খাবেন। একদিন খেয়েও এলেন। এভাবে তিনি কখনও তেলি বাড়ী, কখনও ডোম বাড়ীতে গিয়ে জল খেয়ে আসতে লাগলেন। তিনি আস্তে আস্তে ঐ সব বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করলেন এবং ঐ জাতের ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে তুললেন। ব্যাপারটা জানাজানি হলো। বাড়ীর বয়স্কদের কানে এলো। রামস্বামীর পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিল। ব্রাহ্মণরা যা আচার-কানুন মেনে চলে, এঁরাও তাই মেনে চলেন। অর্থ ও সম্মানে ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম কিসে! বাড়ীতে সব সময় ঠাকুর-দেবতার পূজা-আরাধনা ও ধর্মকথা হয়। বাড়ীর ব্যাপারে, তার বাবা খুব একটা মাথা ঘামাতেন না।

এ ব্যাপারে, তাঁর মা যেন মুষড়ে পড়েছেন। তাঁর বাবাকে জানাতে, তিনি ছেলেকে বল্লেন, এ রকম যেন আর করা না হয়। রামস্বামীর মা বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি যেন 'কি দামি জিনিস হারিয়ে ফেলেছেন।' তাঁর মায়ের ভাবনা—ব্রাহ্মণরা কি আগের মত সম্মান দেবে! যদি পূজা-আর্চা করতে না আসেন। যদি দেবতারা অখুশি হয়। রামস্বামীকে দোহাই দিলেন।

একরোখা রামস্বামীকে কেউ রুখতে পারল না। এমন কি, মুসলিম ছাত্ররাও কিছু দিলে তিনি খেয়ে নিতেন। এ খবরও বাড়ীর লোকের কানে পৌঁছালো। তারা যথেষ্ট বকা-ঝকা করলো। ঠিক এভাবেই রামস্বামীর স্কুল-জীবনের ইতি ঘটে।

রামস্বামীর হৃদয় ও মনে গ্রথিত হয়ে গেল জাতপাত, ভেদাভেদ ও ধর্মের কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়গুলি। ফলে সমাজের যে সমস্ত মানুষ—যাদেরকে নীচ ও ঘৃণ্য বলে মনে করা হত—তিনি তাদের সাথেই বেশি মেলামেশা করতেন।

পরিবার ও সমাজ থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হত। কারণ, তার বয়সটাও

তো সবে কৈশোর। এতে পড়াশুনায় ক্ষতি হত। এভাবে অবাধ চলাফেরার জন্যে পড়াশুনা খুব যে ভাল হচ্ছিল—তা নয়। ফলে, তাঁর এ অবাধ চলা-ফেরা ও আচরণের জন্যে লোকে তাঁকে 'বখাটে ছোকরা' বলে জানত। শেষ পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থাও করা হলো। তাঁর পা দুটোকে একটা কাঠের গুঁড়ির সাথে লোহার চেন দিয়ে আটকে দেয়া হলো। তবুও রামস্বামী নাছোড়বান্দা। নিজের সিদ্ধান্তে অটল। তিনি ঐ কাঠের গুঁড়িটাকে কাঁধে নিয়ে যথারীতি স্বভাবসিদ্ধ ভাবে তাঁর সেই সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

এভাবে কাটলো দিন পনের। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁর পিতা অন্য একটা সরকারী স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দিলেন। সেখানেও কম-বেশি একই অবস্থা। পড়াশুনায় লবডংকা। এভাবে চল্লো দু'বছর। এবার পড়াশুনায় ইতি টানা হলো।

ব্যবসা ও কর্মজীবন

তাঁদেরই একটা দোকানে তাঁকে পাঠানো হলো। তাঁর কাজ হলো—বস্তায় আঁকড় দেয়া এবং সেগুলো নিলাম করা। তবে অবসর সময়ে তিনি 'পুরাণ' কথা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতেন।

তাঁদের বাড়ীতে সন্ন্যাসী ও ভাগবত পাঠকদের খুব আনাগোনা ও প্রভাব ছিল। কেন জানিনা তাদেরকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাদেরকে বিরক্ত করতেন। প্রয়োজনে উপহাসও করতেন। তাঁরা যা কিছু বলতেন— তিনি একটা যুক্তি খাঁড়া করে তাদেরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলতেন। তাতে তারা যারপরনাই বিরক্তবোধ করতেন।

এ অভ্যাসটা বাড়ীর লোকজন পছন্দ না করলেও এর ফলে, তাঁর আলাপ আলোচনার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় এবং অবসর সময়টা ভালভাবে প্রফুল্ল চিত্তে কাটাতে সহায়ক হয়ে ওঠে।

রামস্বামীদের বাড়ীতে বৈষ্ণব ও শৈব পণ্ডিতদের খুব আনাগোনা ছিল। তারা কথকথা পাঠ ও যজ্ঞ বা কালাতশেপম্ করতেন। এসব অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। অবশ্য এ বাড়ীতে অর্থের প্রাচুর্য ছিল। এসব অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য ছিল—সমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও ব্রাহ্মণদের সুনজরে থাকা।

রামস্বামীর মা ভক্তিভরে এ সাধুদের কথা শুনতেন। কিন্তু তাঁর বাবা ছিলেন

অন্য প্রকৃতির। "অনেকটা হয়েছে ভালই"—ব্যাপারটা এরকম ভেবে সন্তুষ্ট থাকতেন। তবে রামস্বামী কিন্তু আলোচনাগুলি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং নির্যাস হিসাবে তিনি ধর্ম ও পুরাণ বিষয়ে অনেক তথ্যই শিখে ফেলেন। এর ফলে, রামস্বামী পণ্ডিতদের একের পর এক প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিতেন। তারা যেভাবেই হোক্ তার উত্তর দেবার জন্যে আঁকুপাঁকু করতেন। এক একজন পণ্ডিতের উত্তর এক এক রকম হতো। ফলে, তাঁর উৎসাহ আরো বেড়ে যেত।

প্রতিবেশীরা এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিত। তারা রামস্বামীর এ বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ যুক্তিবাদী প্রশ্নবাণ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। তাঁর বাবা বিরক্ত বোধ করতেন বটে, তবে তাঁর বুদ্ধিমত্তার তারিফও করতেন। এ প্রসঙ্গে পেরিয়ার নিজেই বলেন, "এ সমস্ত বিষয় থেকে আমার জাতপাত, ধর্ম, দেবতা ও শাস্ত্র বিষয়ে বিশ্বাস হারাতে শুরু করলো।"

এ কথা বলা হয়ে থাকে যে—একজন ব্যক্তির জীবন, তার লক্ষ্য, তার আদর্শ গড়ে ওঠে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক মেলামেশা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে রামস্বামী বলেন : "একথা বাস্তবিক ভাবে সত্য। কিন্তু তার জীবনে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মেলামেশা তাঁকে প্রভাবিত করেনি।"

তার যৌবনকালের একটা ঘটনা তুলে ধরলে বাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রামস্বামীর বয়স তখন ৩০-এর আশ-পাশ। তার মেলামেশার অধিকাংশ সাথীরা মদ্যপানে আসক্ত ছিল। অনেক সরকারী অফিসার, জমিদার, মিরাশদার প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁরাও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। তাদের সঙ্গে তাঁকে গভীর রাত পর্যন্ত কাটাতে হত। পরের দিন সকাল বেলা চাবির গোছা নিয়ে দোকান খুলতে হতো। প্রতি রাতে মদের জন্যে ঐ সময়ে ৫০/৬০ টাকা খরচ করতে হত। বাবার নির্দেশে তাদের সম্মানার্থে প্রতি রাতে মদের সাথে সোডা জল মিশিয়ে রঙিন গ্লাস তাদের হাতে তুলে দিতে হত। অনেক সময় বেশি নেশা হয়ে গেলে বেহদ্দ মাতালের মত তারা তাঁর গায়ে মদের কুলুকুচি করে দিত।

আরেক রাতের ঘটনা। একজন ডেপুটি কালেক্টর এবং অন্যজন লবণ কমিশনার। দু'জন সুরাপায়ী অতিথি। সুরাপানে যখন স্বর্গসুখ অনুভব করছেন—তখন তারা রামস্বামীকে ধরে মাটিতে ফেলে জোর পূর্বক তার মুখে মদ ঢেলে দেয়ার

চেষ্টা করে। তারা ব্যর্থ হলো। এ জন্যে রামস্বামী বলেন যে, তার মেলামেশা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। তার জীবনে কখনও মদ স্পর্শ করার স্পৃহাও জাগেনি। এ ধরনের মেলামেশার জন্যে তার স্ত্রী তাকে সন্দেহ করতো। তার মুখ খুলে শুঁকে দেখতো যে, সে মদ পান করেছে কিনা। দেখার পর স্বস্তি বোধ করতো।

সত্যিই অবাক হতে হয় যে, এ সমস্ত ঘটনা তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তখন থেকেই তিনি মন দিয়ে ব্যবসাতে মনোনিবেশ করেন এবং ব্যবসাতে সফলতা অর্জন করেন। তাঁর প্রতি তাঁর বাবার গভীর আস্থা ছিল। তাঁর বাবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ফলক থেকে নিজের নাম মুছে দিয়ে রামস্বামীর নাম লিখে দেন। কোন ব্যাপারে কেউ তাঁর বাবার কাছে গেলে, তিনি ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

এছাড়া মন্দির ও দেবস্থানের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্মগুলো যেন রামস্বামীদের পারিবারিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারেও তাঁর বাবা তাঁকে লক্ষ্য রাখতে দায়ীত্ব দেন।

সব দায়ীত্ব অর্পণ করার উদ্দেশ্য ছিল যে—এভাবে হয়তো পুত্রের মননশীলতার পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাঁর পিতা এরূপ আশাও করতেন যে, এর ফলে হয়তো ছেলে ধর্মশীল হয়ে উঠবে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মাবে। তাঁকে দেবস্থান সমিতিতে সম্পাদক ও সভাপতি হিসাবে কাজ করতে হয়েছে।

যখন তাঁর মনের মধ্যে এ পরিবর্তনের ঝড় বইছে, তখন তাঁকে এ সব দায়িত্বপূর্ণ বিষয় কাঁধে নিতে হচ্ছে। যে সব বিষয়ে তিনি অবিশ্বাস ও অযৌক্তিক মনে করতেন, সে সব বিষয় সততার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে সে সব অনুষ্ঠান আন্তরিকতা ও যত্নশীলতার সঙ্গে সম্পাদিত করতেন।

রামস্বামীর সত্যিকার আগ্রহ ছিল সমাজ থেকে জাত পাতের বেড়াজাল ছিন্ন করা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারকে দূরীভূত করা। তিনি কখনই মনে করতেন না যে, তিনি একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি এ কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। যে ভাবেই হোক্, তাঁর পরিবার সুখেই জীবন-যাপন করত। কারো ওপর নির্ভরশীল হতে হয়নি। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর পরিবারের উন্নতি ঘটানো হয়। এর থেকে সুখের আর কি হতে পারে।

অন্য ভাবে বলতে গেলে, একজন মানুষের প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য ও তাঁর

আদর্শের সফলতার জন্যে কঠোর শ্রম সংকল্প। সে অলস হবে না এবং পরনির্ভরশীলও হবে না। ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে বা অপরের অনুগ্রহের জন্যে সে তার আদর্শ পরিবর্তন বা ত্যাগ করবে না। একজন মানুষ আমৃত্যু তার আদর্শ অনুসরণের স্বাধীনতা ভোগ করবে।

রামস্বামী অনুধাবন করতেন যে—এ ধরনের স্বাধীনতা ও অনন্য মর্যাদা তাঁর ছিল। তাঁর মনে হত—সেই স্বাধীনতা তাঁর ছিল। আর এ স্বাধীনতাই তাঁকে নিজ আদর্শ অনুসারে চলতে সাহায্য করেছে। এটাই ছিল সব। এছাড়া অন্য কিছু নয়। কোন ভাবেই তিনি **অন্ধবিশ্বাসী** ছিলেন না। রামস্বামী বলেন, মৃত্যুর সময় যদি আমার চেতনা থাকে, তাহলে আমি আমার জীবন সম্পর্কে সুখী থাকবো এবং শান্তিতে মৃত্যুবরণ করবো। আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকবো। আমার কোন অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকবে না। আমি অনুভব করবো যে, আমি কোন কাজ ফেলে আসিনি।"

যেহেতু তিনি জীবিত অবস্থায় উপরিউক্ত কথা বলেন, সেহেতু তাঁর অবশ্যই কাজ আছে বা থাকবে। কাজ ছাড়াই জীবনের অর্থ হয় না। তিনি নিজেই নিজের লক্ষ্য ঠিক করেছিলেন। তিনি সংকল্প করেন যে, জাতপাতের কুফল দূর করার এবং কল্পিত ঈশ্বর ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাঁর ঐকান্তিক কাজের কথা ঘোষণা করেন। তা হলো, সমাজের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করা।

তিনি বলেন, "যখন এ বোধ ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করলো, তখন সমাজ সংস্কারের কাজকে আমি আমার একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলাম।"

আত্মসম্মান আন্দোলন

এ ইচ্ছাকে সামনে রেখে পেরিয়ার রামস্বামী তার "আত্মসম্মান" আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এ সংকল্প পূরণ হলে—সমাজে আর জাতি-বিদ্বেষ থাকবে না। মানুষের কোন ক্ষোভ থাকবে না। থাকবে না ব্যক্তি স্বার্থপরতা। মানুষ সমাজে খোশ মেজাজে দিন যাপন করবে শুধুমাত্র কি বিনোদনের জন্যে! যে সব লোক ছুটির দিনে জুয়া খেলে—তারাও বিষাদগ্রস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অতৃপ্ত বাসনায় দিন কাটায়। প্রকৃতির কাছে সমাজ অনাবশ্যক ভাবে বিব্রত হয়। এটা মানুষ ও জীবকূল উভয়ের ক্ষেত্রে ধ্রুব সত্য। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকেই জীবনে

ভাল-মন্দের সম্মুখীন হতে হবে।

পেরিয়ার রামস্বামী বলেন, "আমি এসব জেনে বুঝেই এ ধরনের আন্দোলন শুরু করেছি। এটাকে অন্য কথায় **নিষ্কাম কর্ম** বলা যায়।" অর্থাৎ কোন ফলের আশা না করে সম্মানের সঙ্গে এ কাজ সম্পাদন করে যাওয়া। তবে একজন ব্যক্তি এ কাজ কেন করবে? কেননা, কোন ব্যক্তি যখন ফলের আশা নিয়ে কাজ করে, তখন তাকে তা পেতেই হয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক জীবকেই কোন না কোন কাজকে বেছে নিতে হয়।

রামস্বামী তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে বেছে নেন **আত্মসম্মান আন্দোলন**-কে। এ কাজে তিনি কখনও বিষাদগ্রস্ত হননি। এ কাজ সব সময় তার ব্যক্তিমনে উৎসাহ সঞ্চারিত করেছে।

আত্মসম্মান আন্দোলনের তত্ত্ব ও সংজ্ঞা

এ আন্দোলনের তত্ত্ব পৃথিবীর সকলেই জানে। **কার্য কারণ তত্ত্ব**। পৃথিবীর বিজ্ঞজন কর্তৃক স্বীকৃত। মানুষ প্রত্যেক বিষয়ে কারণ খোঁজে। মানুষ প্রাকৃতির আচরণকে গবেষণা করতে শুরু করেছে। **অজ্ঞ জীবন দাসত্ব জীবন বলেই বিবেচিত হয়।**

আত্মসম্মান আন্দোলনের তত্ত্বকথা কিন্তু এটাই যে, কোন কিছু করার আগে চিন্তা করা। সেটা সঠিক না ভুল। তার কারণ **অনুসন্ধান** করা। তা বিচার বিশ্লেষণ করা, গবেষণা করা, সত্যকে শ্রদ্ধা করা। এটাই আত্মসম্মানের সংজ্ঞা। মনে রাখা উচিত। —**স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান** নিবিড় ভাবে জড়িত।

রামস্বামী বলেন : "যারা আজকের দিনে আত্মসম্মানকে দূরে ঠেলে দিয়ে স্বাধীনতার বুলি আওড়ান, এটা অবান্তর ছাড়া আর কিছু নয়।" রামস্বামী তাই দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেন, "**আত্মসম্মান** ব্যতীত স্বাধীনতার কোন সুফল হতে পারে না।"

রামস্বামীর ভাষায় ঃ এটাই সেই আত্মসম্মান, যা স্বাধীনতার বোধকে চালনা করে। স্বাধীনতা বলতে আত্মসম্মানবোধের স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার পায়। একজন প্রকৃত স্বাধীনতা প্রেমিকের কাছেও স্বাধীনতা স্পষ্ট নাও হতে পারে—যদিও বা তিনি এটা বোঝেন শুধুমাত্র একটা বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা

উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক্ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। পেরিয়ার বলেন—গান্ধী ও জওহরলাল রাজনীতিতে দুটি জ্যোতিষ্ক।

গান্ধী বলেন, "হিন্দুত্ব ও পুরোনো পদ্ধতির পুনর্জাগরণই স্বাধীনতা। বৃটিশের কাছ থেকে মুক্তিই স্বাধীনতা।" কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মনুষ্য সমাজে যে সকল দুঃখ কষ্ট রয়েছে—সেগুলি ঐ স্বাধীনতায় দূর হবে না। কেননা, এ ধরনের স্বাধীনতা অর্জন আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে।

একটা গল্পের অবতারণা করতেই হয়—এক ব্রিটিশ রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ, একজন সাধারণ মহিলাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন বলে। তাঁর ঐ রাজমুকুট ত্যাগের পেছনে তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গই ছিলেন।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে এটা বিশ্বাস করা সম্ভব কি—এ ধরনের স্বাধীনতায় গান্ধী ও নেহেরুর ভাবনার স্বাধীনতায় আত্মসম্মানবোধ বলে কি কোন কিছু ছিল? আমরা কি মনে করি যে, স্বাধীনতার সঙ্গে যদি আত্মসম্মানবোধ থাকত, তাহলে বৃটিশ রাজার বিবাহের সঙ্গে সিংহাসন ত্যাগের প্রশ্ন উঠত কি? সুতরাং মানুষের কাছে তার জীবনে **'আত্ম সম্মান'** ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

যদিও পেরিয়ারের এ **আত্মসম্মান আন্দোলন** গোড়ার দিকে খুবই ক্ষুদ্রাকারে শুরু হয়, তথাপিও অনেক দমনপীড়ন ও বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক পর্যায়ে মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু কেন? এ আন্দোলন তামিলনাড়ু, মালয়ালম, অন্ধ্রনাড়ুর সমাজে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করে। বড় বড় পণ্ডিত, আচার্য ও বিদ্বানেরা মানসিকভাবে বদলে যেতে থাকেন।

রামস্বামী এ আন্দালনের মাধ্যমে গান্ধীজিকেও ডিগ্‌বাজী খাইয়েছিলেন। জনগণ আরো অধিকার ও প্রকৃত স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত করতে থাকে। উঁচু জাত ও নীচু জাতের ব্যবধানটা দ্রুত কমে যেতে থাকে।

ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের গতিপথ ও চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তিত হতে থাকলো। বাইবেল ও কোরাণের নতুন ব্যাখ্যা দেয়া হতে থাকলো। কিন্তু এতে

প্রবল বাঁধা সৃষ্টি করে কংগ্রেস। প্রকৃত অর্থে ঐ সময় কংগ্রেস যদি বিরূপতা না করতো—তাহলে আত্মসম্মান আন্দোলন ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। ভারত থেকে নির্মূল হয়ে যেত ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকড়।

আমরা এ আন্দোলনের আদর্শ, ভাবনা ও তার গতি প্রকৃতি গোটা ভারতে ছড়িয়ে দিতে চাই। যুব সমাজও কাজের দায়ীত্ব কাঁধে তুলে নিতে ইচ্ছুক।

রামস্বামী শেষ জীবনে বলেন, "জীবনে কোন ত্রুটি যদি কখনও অনুভব করি, তবুও তা এ আন্দোলনকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করবে না। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ডাক দেন, "যুব সমাজ, কাজের জন্যে তৈরি হও। আত্মসম্মান আন্দোলন ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না।"

আত্মসম্মান ঃ ঈশ্বর ও ধর্ম

ধর্ম ঃ ধর্ম হলো পারস্পরিক জীবন-যাপনের জন্যে নীতিসমষ্টি এবং মানুষের আচরণের নিয়মাবলী। **আত্মসম্মান আন্দোলন** এরকম প্রকৃত ধর্মের কখনও বিরোধী হতে পারে না। এমন কি যদি বলা হয় যে, ধর্ম হলো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর নীতি নির্দেশনা—তাতেও এ আন্দোলনকারীদের নাক গলানোর কোন কারণই নেই। এটা নিতান্তই কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত।

কিন্তু ধর্ম যদি সমাজের শুভবুদ্ধিকে ধ্বংস করে, আত্মসম্মানকে বিপন্ন করে, ধর্ম যদি মানুষকে উচ্চ-নীচ বলে ভেদাভেদ করে, ধর্ম যদি অনৈক্য সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে খর্ব করে—তাহলে এ আন্দোলন ছেড়ে কথা বলবে না। পেরিয়ার আরো বলেন—"বিদেশিদের ধর্ম নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। হিন্দু ধর্ম, যেটাকে আমাদের ধর্ম বলা হয়—সেটা নিয়েই আমাদের আলোচ্য বিষয়।"

পেরিয়ারের কথায়—

(১) ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য—ধর্ম ছাড়া অন্য কোন কারণ আছে?

(২) হিন্দু ধর্মই কি দায়ী নয়—এত ভাগ ও বিভেদের জন্য?

(৩) হিন্দু ধর্মই কি দায়ী নয়—উঁচু-নীচু ও জাত-পাত সৃষ্টির জন্যে?

এ সবের প্রমাণ বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থে বিদ্যমান।

পেরিয়ার দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, "যদি আমরা জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা চিরতরে

নির্মূল করতে চাই—তাহলে ধর্ম, শাস্ত্র এবং বেদ ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে কি?

পেরিয়ার বলেন—

(১) একবার ভাবুন তো, যদি কোন অব্রাহ্মণ অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তাকে **ধর্মান্তর তথা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ** করা ছাড়া উপায় আছে কি?

(২) গভীর ভাবে ভেবে দেখুন—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন কি?

(৩) এবার বলুন—হিন্দু ধর্মের বিরোধীতার স্বপক্ষে আর কোন যুক্তির প্রয়োজন আছে কি?

আমরা জানি—যে মুহূর্তে ধর্মের নাম করা হয়, মানুষের মনে তখনই এক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়।

তাই কার্ল মার্কস্ বলেন, "ধর্ম হলো আফিম্"

কেউ ভেবেও দেখে না যে, ধর্ম মানুষকে কি দিয়েছে?

ধর্মীয় উন্মাদনার কুফলকে যদি মদ্যপানের কুফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়—তাহলে শেষের ক্ষতিটা কম। কারণ মদ্যপানের পর শুরু হয় ক্ষতি। কিন্তু যখনই ধর্মের কথা চিন্তা শুরু হয়—তখনই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ধর্ম সমাজে যে শুধুমাত্র উঁচু-নীচু সৃষ্টি করেছে তা নয়, আর্থিক ক্ষেত্রেও ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, ধর্মই কি সৃষ্টি করেনি এক শ্রেণীর মানুষ কঠোর পরিশ্রম করবে, অন্য শ্রেণী তাদের শ্রমের ফসল বিনা শ্রমদানে ভোগ করে যাবে?

শ্রমজীবি মানুষের পৃথিবীর কোন সম্পদেরই অধিকার নেই। অল্পসংখ্যক লোক, যারা শ্রমবিমুখ, তারাই পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করে যাচ্ছে। এটা কি ধর্মের জন্যে নয়? সাধারণ মানুষ দরিদ্র। ধর্মীয় কারণে জাতি হিসাবে নীচু—অর্থাৎ তারা চাকর, তারা জঘন্য কীট। অন্যদিকে, ধর্ম যাদের পরিশ্রম করা থেকে মুক্তি দিয়েছে—তারা সকল দুশ্চিন্তার' উর্ধ্বে। তারা সম্পদ জমাতে পারবে। শূদ্রদের সে অধিকার নেই। বরং তাদেরকে দাসে পরিণত করা যাবে।

পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি যে সকল প্রাণীর বিচার ক্ষমতা নেই। যারা যুক্তিবাদী নয় বলে বিবেচিত—তাদের মধ্যেও উঁচু-নীচু জাতের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু

মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব ও যুক্তিবাদী বলা হয়। তারা কেন ধর্মের জন্যে এসব কুফল ভোগ করবে?

পেরিয়ারের ভাবনা

কুকুরদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ কুকুর, একজন পারিয়া (নীচু জাতি) কুকুর দেখতে পাওয়া যায় না। গাধা, বানরদের মধ্যেও দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে এটা বিদ্যমান। এটা কি ধর্মের জন্যে নয়?

হিন্দুধর্ম কত যুগের প্রাচীন! এ পর্যন্ত ধর্ম কি সমাজের কোন ভাল কাজে এসেছে? ভগবানের অবতার বলে স্বীকৃত রামের যুগেও নীচু জাতের লোক ছিল।

হরিশ্চন্দ্রের সময়েও নীচু পারিয়াদের শ্মশানে দেখা যায়। নিজের স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ারও রেওয়াজ ছিল। অধুনাও সে সব দোষাচার বিদ্যমান। তাহলে আমরা কেমন করে বলব যে, ধর্ম মানুষকে প্রগতির পথে নিয়ে গেছে বা যাচ্ছে।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, ধর্মের নামে কত বাজে ধারণা মানুষকে শেখানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে—শবদেহ পুড়িয়ে ছাই হয়—সেই ছাই জলে দেয়া হয় এবং মনে করা হয় সেই ছাই জীবিত। এটা কে বলে? ব্রাহ্মণরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে মৃতের বংশধরগণ ব্রাহ্মণকে চাল, ডাল, কাপড়, কলাটা-মূলোটা, ফলমূল, জুতো, গরু এমনকি, সোনাও দান করে থাকে। শুধুমাত্র বিশ্বাসে এসব দান করা হয় যে, মৃতের কাছে এগুলি ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে দেবে নিশ্চিতভাবে।

তাহলে আমরা কেমন করে বিশ্বাস করবো যে, এ সমস্ত কাজ যেসব মানুষ করে তাদের বিন্দুমাত্র বোধশক্তি বা যুক্তি, বিচার-ভাবনা আছে। পেরিয়ার বলেন যে, তিনি এও বলছেন না—মৃত ব্যক্তিকে অসম্মান করতে হবে। প্রশ্ন—তাহলে মৃতের পরিবারবর্গ কেন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণকেই এসব জিনিষ দেবে? কেন তাদের পায়ে হাত দিয়ে নতজানু হতে হবে? কেন তাদের পা ধুঁইয়ে দিতে হবে এবং পা ধোঁয়া জল পান করতে হবে?

এটা যদি হিন্দু ধর্ম বা তত্ত্ব ও দর্শন হয়—তাহলে সে ধর্ম না থাকাই ভাল।

এছাড়া আরো কত ক্রিয়া-কর্ম আছে—মুখে ভাত, হাতে খড়ি, দীক্ষা, গৃহ-প্রবেশ, বিবাহ, রজঃস্বলা অনুষ্ঠান, এ রকম যা যা আছে, সবই ব্রাহ্মণদের লাভের জন্যে।

অন্যান্য দেশ ও ধর্মের মানুষেরা কি এ ধরনের আচরণ করে? আমরা আমাদের জ্ঞানকেও শ্রদ্ধা করিনা। এ ধরনের কাজ করেও আমরা লজ্জা বোধ করি না। আমরা কি শুধুমাত্র হাড়-মাংসের জড়পিণ্ড?

পেরিয়ার বলেন—আমি যখন এসব বিষয় ভেবে দেখার কথা বলি, কোন কোন ব্যক্তি এতে ক্রুদ্ধ হয়। এ অধঃপতনের জন্যে কে দায়ী? ধর্ম না সরকার?

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন ঘটছে। অথচ আমরা ভারতবাসীরা এখনও দেবতা ও তাদের সুকর্ম ও কুকর্ম নিয়ে আলোচনা করি। এটা সত্যিকার অর্থে **বর্বরতারই সামিল**।

পেরিয়ার বলেন—যেহেতু আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি সম্মত অভিযোগ পায় না, সেহেতু তারা আমাদের নাস্তিক বলে এবং আরো বলে—কুমতলব বা অনাসৃষ্টি করার ইচ্ছা আছে।

ঈশ্বর সম্পর্কে খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা প্রাচীন বর্বর জাতি থেকে কিছুটা পরিবর্তিত। তারা বলে—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তা মানুষের বোধগম্যের অতীত। তারা বলে, যারা ভাল কাজ করে, ঈশ্বর তাদের ভাল করে এবং যারা মন্দ কাজ করে, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেন। এ ধর্মের বিজ্ঞজনেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন—কেননা, তারা মনে করেন যে, ঈশ্বর আছে। ভাল কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাদের অধিকতর মঙ্গলদায়ক সমাজের সৃষ্টি করে দেবেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হাজার হাজার দেবতা সম্পর্কে হিন্দুরা কি কিছু ভেবে থাকে? হিন্দুরা কেন বহু দেব-দেবীর পূজা করে? তারা কেমন করে এলেন? এবার দেখুন কিভাবে তারা ঈশ্বরত্ব পায়?

গরু, ঘোড়া, ষাঁড়, বানব, পাথর, ধাতু, পাখি, কাগজ—এদের সকলকেই দেবত্ব প্রদান করা হয়।

পেরিয়ার বলছেন—যখন আমি একবার কাশীতে গেছি—দুটো কুকুরকে পুজো করা হচ্ছে। পুরোহিত এর কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। এছাড়া দেবতাদের স্ত্রী আছে। তাদের গণিকা আছে, মৈথুন আছে। এও বিশ্বাস করানো হয় যে—এ সকল দেবতারা খায়-দায়, ঘুমায়, বিয়ে-থা করে এবং সন্তানও উৎপাদিত হয় এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদিও হয়ে থাকে।

এসব দেবতা সম্পর্কে যা কিছু আলাপ করুন, আপত্তি নেই। কিন্তু অপহৃতা বালিকা ও গণিকাদের সঙ্গে দেবতারা সম্ভোগে লিপ্ত হয় এবং তা উৎসব হিসাবে দেখানো হয়। এর জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। জনগণের বহুমূল্য সময়ও নষ্ট হয়। এতবড় মিথ্যাচার এই আধুনিক যুগে করা উচিত কি?

(১) এসবের জন্যে কি আমরা লজ্জা পাব না?

(২) এসব বিষয় বলার জন্যে কি আমাদের নাস্তিক বলে বাহবা কুড়োনো ঠিক?

(৩) দেবতারা যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে কি তাদের এ রকম হওয়া উচিত?

(৪) কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এটা মেনে নেবেন?

(৫) আমাদের যে পূজা, তর্পন, বিবাহাদি ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়—এগুলি কি দেবতার কিছু প্রয়োজন আছে?

(৬) ঈশ্বর কি (সুপ্রিম পাওয়ার) এসব অনুমোদন করেন?

(৭) দেবতাদের পুতুল মনে করে আমরা বছরে তাদেরকে তিন বার বিবাহ দিয়ে থাকি। কেন? সত্যিই যদি দেবতাদের একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়, তাহলে কি দেখব না যে, গত বছরের স্ত্রীদের কপালে কি ঘটল? তাঁদের কি ত্যাগ করা হয়েছে? তারা কি বিচ্ছিন্না হয়ে গেছে? তারা কি তাদের স্বামীদের ত্যাগ করে সকলে চলে গেছেন? নাকি সকলে মারা গেছেন? এসব কি আমাদের ভেবে দেখা উচিত নয়?

(৮) কেন ফি বছর বিবাহ-বার্ষিকী পালন করা হয়?

(৯) কেন এত গান-বাজনা, প্রদর্শনী, আড়ম্বর এবং দেদার খরচ করা হয়?

(১০) মানুষ কি জানে বিবাহাদিতে কারা ভুরিভোজ করে?

(১১) বিভিন্ন জায়গায় বছরে উৎসব হয়। এসব থেকে আমরা কি কিছু লাভ করেছি?

(১২) শিক্ষাক্ষেত্রে এ দেশে ৯৫% মানুষ নিরক্ষর (পেরিয়ারের সময়ের কথা)। পৃথিবীর আরো একটা দরিদ্র দেশ বলে বিবেচিত। তাহলে আমরা চিন্তা করব না কেন দেবতার নাম করে এত অর্থকড়ি অপব্যয় করা হচ্ছে?

(১৩) দিনে আমরা কতবার দেবতার পুজো করি ও নৈবেদ্য দিয়ে থাকি। কত চাল-ডাল, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেবতার নামে উৎসর্গ করি। কিন্তু

সাধারণের শিক্ষা নেই, কর্মসংস্থান নেই, ঘরে দু'মুঠো খাবার নেই। অন্যদিকে, আমরা পয়সা নষ্ট করি! কোন সৎ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এসব সহ্য করবে?

(১৪) আমরা দেখতে পাচ্ছি—প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কিসের জন্যে? একাদশী, অরুদ্র, যাই পুশম, কার্থিগাই (বাংলায় অমাবস্যা, সত্যনারায়ণ, ত্রিনাথ প্রভৃতি) ইত্যাদি পালন করার জন্যে।

(১৫) আরো খরচ হয়—তিরুপতি, তিরুচেন্দুর, রামেশ্বরম (বাংলায় তারাপীঠ, তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর) প্রভৃতি দেখতে যেতে।

আমরা যদি দেখি—এসব খরচের জন্যে কত নষ্ট করা হয়েছে, তাহলে কেউ প্রত্যয়ের সাথে তা বলতে পারবে না। দেবতারা কোন ভাবে এসবের জন্যে জনগণের মঙ্গল করেছে কি? এ বিপুল অর্থ যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়, তাহলে আমরা কর ছাড়াই সরকার চালাতে পারব।

আমরা যদি নতুন নতুন কল-কারখানা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গড়ে তুলতে পারি, তাহলে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি কমে যাবে। বিদেশীরা আমাদের শোষণ করতে পারবে না।

শুধুমাত্র বিশেষ একটা শ্রেণীর মানুষকে অলস রেখে—তাদেরকে সুখে থাকার জন্যে কেন আমরা আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ এভাবে বোকার মত খরচ করবো?

দেবতা ও ভক্তি

দেব-দেবী ও ভক্তির নামে আমরা কিরূপ বোকার মত আচরণ করি। যখন আমরা কাঁধে কাভাড়ি (বাক) বয়ে নিয়ে চলি, তখন আমাদের কতটা কদাকার বলে মনে হয়। গায়ে গেরুয়া পোষাক জড়িয়ে লোকেরা রাস্তায় গড়াগড়ি দেয়। মানুষ মাথা কামিয়ে, গোটা দেহে কাঁদা-ছাঁই মাখে। তারা নিজেদের দেহে ছোট ছোট তীর ফোটায়। তারা নোংরা জলে চান করে। এ সবই দেবতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পালিত হয়।

এরপর দুধ, ঘি, দই, মধু, ফলের রস পাথরের মূর্তিতে ঢালা হয়। এসব মূল্যবান তরল পদার্থ চলে যাচ্ছে নর্দমায়। ভক্ষনীয় জিনিষ বিনষ্ট করা হচ্ছে। পেরিয়ার বলেন—

(১) আমাদের কি এসব রঙ্গরস দেখতে হবে?

(২) এসব দেবতাদের কি কোটি কোটি টাকার সোনার প্রয়োজন আছে?

(৩) দেবতাদের কি মূল্যবান রেশমী কাপড়ের প্রয়োজন আছে?

(৪) কেন সুউচ্চ চূড়া ও অনেক এলাকা নিয়ে পাঁচিল ঘেরা দেবমন্দির?

(৫) কেন সোনা-রুপোর মূর্ত্তি?

(৬) এগুলি কি জনগণের সম্পত্তি নয়?

(৭) ধর্মীয় কর্তব্যের নামে মূর্ত্তির পেছনে অযথা কেন অর্থ নষ্ট করবো?

(৮) এভাবে কি অলস ব্রাহ্মণদের অর্থ উপার্জনে সহযোগিতা করবো?

এর পরিণামস্বরূপ তাদের গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা আই-এ-এস অফিসার, জজ্, রাজ্যের আমলা বানানোর পথ সুগম করে। এসব পূজা-অর্চনা যদি দেবতাদের অনুগ্রহ লাভের জন্যে হয়, তাহলে সেখানে দেবতাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়, এসব ভেবে দেখা উচিত নয় কি? পেরিয়ার আরো বলেন—এবার আসুন, আমরা ধর্মাবলম্বীদের দেখি।”

(১) মুস্লিমরা কোন্ ধরনের দেবতার পূজা করে?

(২) খ্রীষ্টানরা কোন্ ধরনের পূজা-অর্চনা করে?

(৩) কোন যুক্তিবাদী ভারতীয় কি এসব মেনে নেবে?

(৪) কবে বা কখন আমরা দেবতার প্রতি ভক্তির সঠিক মার্গে পৌঁছাতে পারবো?

পেরিয়ার বলেন, যখন আমি একথা কাউকে জিজ্ঞেস করি, তখন ব্রাহ্মণরা সেই বস্তা পচা বাক্য ব্যবহার করে—‘নাস্তিক’। এ সবে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ও তাদের উত্তরাধিকারীগণ এটা ভাবে যে, অশিক্ষিত জনগণ তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। ফলে, দেবতারা ধর্মীয় বিপদ থেকে আরো গভীরতর বিপদের সম্মুখীন। এ সব অসভ্য আচরণকারীরা আস্তিক না নাস্তিক?

সে যাই হোক, আমরা কখনই তাদের কাজ-কর্মে ভীত হবো না। আমরা যেটি সঠিক বলে বিবেচনা করবো, তা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করবো। আমরা নির্ভীকচিত্তে বলবো—আমাদের ধর্ম ও দেবতারা হচ্ছে একটা মারাত্মক ব্যধি। যদি আমরা আমাদের মানুষের মন থেকে এসবের অস্তিত্ব বিলোপ করতে না পারি—তাহলে দেশ ও জনগণের উন্নতি ও মঙ্গলসাধন অসম্ভব। সুতরাং আমরা যেটা বুঝি, সেটাই বলি।

পেরিয়ার জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—এসব তোমাদের ভাবতে হবে ও বাস্তবে তা করে যেতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণদের মত কখনই বলব না যে, আমরা যা বুঝি, যা বলি—তা তোমাদের বিশ্বাস করতেই হবে।

ব্রাহ্মণদের অভিমত, তারা যা বলে—সে সব বিশ্বাস করে সে কাজ করলে মানুষ স্বর্গের নন্দন কাননে পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে, অবিশ্বাসীরা নরকের বীভৎস আঙ্গিনায় ঠাঁই পাবে।

পেরিয়ার ১৯২৫ সালে কংগ্রেস দল থেকে ইস্তফা দেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, ভারতীয় রাজনীতি হচ্ছে—ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে তারা রাজনীতিতে সিংহভাগ দখল করে নিয়েছে। তাদের সংগ্রাম জনগণের হিতার্থে একটা মঙ্গলময় সরকার গঠন নয়। এ সংগ্রামের পেছনে কোন সার্বিক মহান উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণদের এ একচেটিয়া কারবার খতমের পক্ষে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন।

তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করেন যে, দেবতা, ধর্ম এবং জাত-বিভাজন অন্য মানুষদের শোষণ করার রাস্তাকে সুদৃঢ় করেছে এবং এর ফলে, তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন-যাপন করতে পারছে। এসব উপলব্ধি করার পর পেরিয়ার তাঁর **আত্মসম্মান আন্দোলনের** সূত্রপাত ঘটান। যারা এ কাজে সহযোগিতা করতে আগ্রহী তাদের নাম তিনি নথিভুক্ত করতে শুরু করেন।

কংগ্রেস দল শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংস্কারের নীতিকে অনুসরণ করার পক্ষে সওয়াল করে। এতে **সামাজিক-সংস্কারের** দিকটা অবহেলিত হতে থাকে। এ দল গঠনমূলক কর্মসূচী কার্যকরী করার নামে ক্ষমতা দখল ও রাজনৈতিক প্রভূত্ব কায়েম করার ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করে। পেরিয়ারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—**সমাজসংস্কার**। যেহেতু তার সর্বাধিক প্রচেষ্টা ছিল দেবতা, ধর্ম, জাত-পাত ও শাস্ত্রের নামে কু-প্রভাব দূরীকরণ—সেহেতু তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল, রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য খর্ব করা। (এ আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে ব্রাহ্মণ আধিপত্য আজ তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে)। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না। জনতা নিয়েই তাঁর ওঠাবসা ছিল। ফলে, তাঁর দায়িত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তাঁকে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হয়েছিল। তার কাজটি বাস্তবিক পক্ষে খুবই কঠিনতর ছিল।

তিনি যখন ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত করতে উদ্যত হলেন—তখন

সুচতুর ব্রাহ্মণরা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়ো হতে থাকে। আবার যখন তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে থাকেন—তারা সুকৌশলে পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধাবিত হতে থাকে। ফলশ্রুতি হিসাবে তাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রে, অসচেতন জনগণকে জাগরণের মন্ত্র শোনাতে হয়েছিল। সত্যি সত্যিই এ দ্বিবিধ রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে গিয়ে তাঁকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এ সব বাধা-বিপত্তি তো ছিলই। এর সাথে সাথে তাঁর নিজের লোকদের দ্বারাও তাঁকে বেশ কিছু ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল। যারা তাঁর অনুগামী হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে চলা-ফেরা করে বিভিন্ন বিষয়ে পরিণত বুদ্ধির ছাপ ফেলেছিল অথবা অনেকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল—তারাই তলে তলে শত্রুপক্ষের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। বহুক্ষেত্রে, তারা পেরিয়ারের শত্রুপক্ষের হাত শক্ত করে দেয়। সত্যিকার অর্থে এ সকল ঘর শত্রুরা তাঁকে এবং তাঁর এ সংগ্রামী কাজ-কর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে।

এ ব্যাপারে পেরিয়ার বলেন—**প্রহ্লাদ ও বিভীষণ** তাদের জন্ম থেকে যে কাজ করেছিল, এরাও তদ্রূপ কর্মে লিপ্ত ছিল। আমার জীবনের চল্লিশটি বছর ধরে **আপোষহীন সংগ্রাম** তথা **জনমুক্তির** কাজ করে এ ঘর শত্রুদের এ ধরনের আচরণের কোন কারণ খুঁজে পাইনি। শুধুমাত্র এটাই বলা সমীচিন যে, বিজ্ঞজনেরাই আমার বিগত ৪০ বছরের জনসেবার মূল্যায়ণ করতে পারবে।

আমরা মঠ-মন্দির, ধর্মস্থান, বিদ্যালয়, সরকারী রাস্তাঘাট, হোটেল-রেঁস্তোরা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদাভেদ দেখি। এই যে উঁচু নীচু ভেদভাব—তা কি আমরা, না ব্রাহ্মণরা সৃষ্টি করেছে?

যদি কেউ গভীর ভাবে বিষয়টা নিয়ে ভাবে, তাহলে কেউ আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে গণ্য করতে পারবে না। ব্রাহ্মণরা কখনও এক মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখে না যে, আমাদেরকে জঘন্যতম জায়গায় নামিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে উচ্চতম ও শ্রদ্ধার আসনে তুলে ধরে চরম নিন্দনীয় কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা কি চাই? **আত্মসম্মানের সাথে সম-মর্যাদা**। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এ ধরনের ভাবনা ও প্রচেষ্টাকে তারা মনে করে, জঘন্য পাপ ও গুরুতর ভুল।

আর্য ধর্মমত ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে এবং অন্যদিকে,

আমাদেরকে শূদ্র ও অস্পৃশ্য বানিয়ে রাখার নিমিত্তে তারা তাদের আন্দোলনের নাম দেয়—**ঈশ্বর ভক্তি আন্দোলন** বা **আস্তিক্যবাদী আন্দোলন**।

বিপরীত দিকে, পেরিয়ারের ভাষায়—শূদ্র ও অস্পৃশ্যতা বিনাশের নামে আমাদের যে আন্দোলন, তারা একে **নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন** বলে প্রচার করে।

তাদের বক্তব্যঃ (১) আমাদের সাথে কথা বলা বা দেখা করা মহাপাপ। (২) কিন্তু তারা এও বলে যে, তাদের চরণতলে মাথানত করলে সেটা পাপ নয়। (৩) তারা সগর্বে এও বলে যে, তাদেরকে ভূ-স্বামী বা গুরু ঠাকুর বলা পাপ নয়। (৪) শূদ্রদের দেখা বা স্পর্শে পাপ হলেও তাদের কর্তৃক দেয় জিনিষপত্র দেখা বা স্পর্শে পাপ নেই। (৫) ব্রাহ্মণকে না চাওয়ার আগে কোন কিছু প্রদান করাই উচিত।

(৬) তারা যা কিছু স্পর্শ করেছে বা যার স্বাদ গ্রহণ করেছে—সেগুলিই দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবে।

(৭) তাদেরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও পা ধোয়া জল পান করলে নাকি আমরা স্বর্গধামে পৌঁছাতে পারবো।

(৮) তারা ব্রাহ্মণত্বের ধ্বজা তুলে ধরার জন্যে প্রস্রাব ও মলত্যাগের সময় পবিত্র গলার সূতো (পৈতা) কানে জড়িয়ে নেয়।

(৯) এতে নাকি দূষণ রোধ হয়।

(১০) তারা তাদের পবিত্র সূতোর দড়ি গলায় ঝোলায়, একমাত্র স্নানের পর অথবা যখন তারা নিজেদেরকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে করে।

(১১) এ ছাড়া শূদ্রদের সাথে কথা বলার সময় এ সুতোদণ্ড কানে ঝুলিয়ে নেয়।

(১২) এ সকল কর্ম-কাণ্ড কি সাম্প্রদায়িক নয়?

১৩) তাদের সঙ্গে কথা বলতে হলে, তাদের নির্দেশ থাকে যে, আমরা যেন হাত অথবা অন্য কোন কিছু দিয়ে মুখটা ঢেকে নিই।

(১৪) তাদের আপত্তি এ কারণে যে, মুখের শব্দ-তরঙ্গ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে।

(১৫) এ সব কি মানবিক আচরণ?

এ ধরণের শত-সহস্র উদাহরণ রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, যারা আমাদের উন্নত ও প্রগতিশীল জীবন-যাত্রার বিরোধী—তারা বরং আমাদের সাম্প্রদায়িক বা নাস্তিক

বলে বাহবা কুড়ায়। আমরা অনেকেই আমাদের মানবাধিকার বিসর্জন দিয়েছি এবং অনেকে ব্রাহ্মণকে ভয় করে চলি।

পেরিয়ার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—আমাদের বিশ্বাস শুধু নয়, প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আমাদের জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করাই আমাদের **আমরণ সংগ্রাম**। মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এ **আপোষহীন সংগ্রাম** চলবে।

এবার নজর দেয়া যাক্—আমাদের ভারতীয় রাজনীতিতে কি চলছে। জাতীয় আন্দোলনের নামে কংগ্রেস দল তাদের ভাল ভাল পদের মোহে আন্দোলন শুরু করে। সে সব পদে অংশীদার হতে চাইলে, তারা আমাদের ওপর দোষের বোঝা চাপায়। তারা সরকারকে সহযোগিতা করে। বিনিময়ে তাদের সন্তানেরা ১,০০০/, ২,০০০/, ৫০০০/ বা ১০,০০০ টাকার চাকুরী পায় (তখনকার সময়ের নিরীখে)।

তারা সরকারকে সমর্থন করে—বিনিময়ে আনুকূল্য লাভ করে আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উঁচু পদগুলি করায়ত্ব করে।

যখন আমরা এ সব পদের আকাঙ্খা করি তখন তারা বলে, আমরা নাকি অযোগ্য। আবার যখন আমরা নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলি, তখন তারা বলে আমরা দেশদ্রোহী বা সাম্প্রদায়িক। (আজ কানহাইয়া কুমারের অবস্থাও ঠিক তাই)। পেরিয়ার এ কথা বলেন আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে। পেরিয়ারের **আত্মসম্মান** আন্দোলনের উৎস খুঁজতে গিয়ে পরিশেষে তাঁর কথা দিয়ে শেষ করা যাক ঃ

এবংবিধ আলোচনার পর আমার সিদ্ধান্ত হলো—**আন্দোলন ছাড়া মুক্তি নেই**। তবে এ আন্দোলন হবে পৃথক ধরনের। আমাদের মুক্তির জন্যে তাই জরুরী এ **আত্মসম্মান আন্দোলনের**। তবেই সমস্যার সমাধান হবে। সমস্যা আছে, তার সম্মুখীন হতে হবে এবং তা অতিক্রম করতে আন্দোলন চাই। তবেই সমাধানের পথ খুলে যাবে। আমরা **স্বাধীনতা** চাই। আত্মসম্মানের সাথে এবং তা আমরা অর্জন করবই। আমাদের উচিত, সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসা। আত্মসম্মানের লড়াইয়ে নিরলস পরিশ্রমের দ্বারা আত্মোন্নতি ঘটানো। প্রত্যেককে নিজ নিজ ভূমিকা নির্দ্বিধায় পালন করা। আমাদের বিশ্বাস—**একদিন ভারত থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকড় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।**

আত্ম-সম্মান আন্দোলনে উদ্বিগ্নতা

আত্ম-সম্মান আন্দোলনের এই অকুতোভয় সংগ্রামী পুরুষ শেষ জীবনে ভারতবাসীর কথা ভেবে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন।

এ সম্পর্কে অন্না (তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী) ১৯৬৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিরুপাথুর পুরসভার ৮০-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পেরিয়ারের উপস্থিতিতে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ পেরিয়ার যা যা প্রচার করেছেন, তার সব কিছুই আপনারা সঠিক বলে মেনে নেবেন না। তার কথাগুলি নিজেরা চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা যাচাই করে নেবেন। যদি মনে হয়, কথাগুলি সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত, তবেই তা গ্রহণ করবেন। তিনি প্রকাশ করছেন আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কথা। তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করছেন। মনে রাখবেন, সাধারণ মানুষদের কাছে শয়তানদের কোন স্থান নেই। তাঁর যুক্তি-সংগত মতামতে আমাদের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সমর্থন দরকার, তা করা হবে। আমরা অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে সাফল্যের সাথে তা প্রয়োগ করতে পেরেছি। সমাজ সেগুলি বিবেচনা করে গ্রহণ করেছে।

তিনি সামাজিক কার্য-কলাপের দ্বারা সামাজিক কু-সংস্কার দূরীকরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। যদি কোন কিশোর এক পেয়ালা কফি পানের জন্য ট্রেন থেকে নামতে চায় এবং ভাবে যে, ট্রেন সঠিক সময়ে ছাড়বে। এ সময়ে পিতা-মাতা কি চুপ থাকবে? তারা বলবে যে, তুমি পরে কফি পান করো।

ঠিক সেভাবে মানুষের উন্নতির স্বার্থে তার এই **আত্ম-সম্মান আন্দোলন**। অন্যান্য দেশ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। পেরিয়ার আমাদের অবহেলা ও নিশ্চেষ্টাকে তিরস্কার করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, দ্রুত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আমি অনুধাবন করেছি যে, তিনি কেন এত উদ্বিগ্ন। তাঁর এই উদ্বেগের কারণ হলো—সামাজিক উন্নতি যতটা হবার কথা ছিল, ততটা হয়নি। অন্য দেশের জাতির মত, আমাদের প্রগতি হয়নি। যদিও তিনি সার্বিক উন্নতির অবমূল্যায়ণ করেছেন; তথাপি তার বিবেচনামূলক উন্নতি ও পরিবর্তনকে কেউ প্রত্যাখান করতে পারবে না।

এ দেশে জাতিভেদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। আজকের দিনে তা

কমে এসেছে। ৩০ বছর পূর্বে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পেরিয়ারের বক্তব্য শোনার। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল যে, সস্তা জনপ্রিয়তার জন্যে কোন বিষয়কে তিনি অতিরঞ্জিত করে বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমি নিজে তার সাথে যোগদান করে এ কাজে ব্রতী হই এবং অনুধাবন করলাম যে, তার ভাবনা চিন্তা বিদ্‌ঘুটে ও বিরক্তিকর হলেও, কোন ব্যক্তি বিষয়টা বিশ্লেষণ করলে—সে আসল সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবে।

আমার সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, কু-সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং নিষ্পেষণ দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। আমি আবেদন করছি—স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যেন প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষা দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অন্না পেরিয়ার সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, নির্যাতিত এবং অবহেলিত ভারতবাসী অসাড় জীবে পরিণত হয়েছে। পেরিয়ারের এই **আত্ম-সম্মান আন্দোলনে** তাদের ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারা জাগরিত হচ্ছে। এ **মুক্তির আন্দোলনে** তারা সাড়া দিচ্ছে। সেদিন বেশি দূরে নেই যে, ভারতবর্ষ জাত-পাতহীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

নতুন পৃথিবীর ডাক

পেরিয়ার বলেছেন ঃ অতীতের পৃথিবী কেমন ছিল, আজই বা কেমন চলছে এবং আগামী দিনের পৃথিবীতে কি হবে? শতাব্দীর অতিক্রমনের ফলে পৃথিবীর কোথায়, কি পরিবর্তন হবে? যুক্তিবাদীরা সে বিষয়ে পূর্বানুমান করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ধর্মীয় পণ্ডিতগণ পুরোনো রীতি নীতি আঁকড়ে ধরে থাকে। কেন তিনি একথা বলেছেন।

কেননা, পণ্ডিতেরা শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। পুরাণের উদ্ভট সাহিত্য বা সে সকল বিষয়, যা যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। সেটা নিয়েই তারা মানুষকে মোহাবিষ্ট করে রাখে। অনেকে এ সকল পুরাণ এবং শাস্ত্র মুখস্ত করে রেখেছেন এবং তারা মনে করেন যে, এর সব কিছু সত্য এবং সঠিক। কিন্তু যুক্তিবাদীরা যুক্তি ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। তারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বাস্তব ধর্মাধর্ম, প্রকৃতির নিয়মাবলীর দ্বারা পদার্থের পরিবর্তন, নানান জীব-জন্তুর উৎপত্তির উৎস ও বিবর্তন, জ্ঞানী-দার্শনিক-মহান ব্যক্তির অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এবং সর্বোপরি নিজের অনুসন্ধানমূলক ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি সব বিষয়ে

বিচার-বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

অন্যদিকে, পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, অতীতের ঘটনাবলীর সত্যতা অপরিবর্তনীয়। তারা অতীত ঘটনার পুনর্মূল্যায়নের বিরোধী। কিন্তু যুক্তিবাদীরা মনে করেন যে, প্রতি মুহূর্তে এই বিশ্ব-সংসার নতুন নতুন পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধের কথায় একে বলে **'ধম্ম-চক্র'**। পৃথিবী সদা পরিবর্তনশীল। এই যুক্তিবাদীরা আরো নতুন নতুন পরিবর্তনশীলতার দিকে এগিয়ে যায়। পেরিয়ার বলেন, পণ্ডিত বলতে সবাই পণ্ডিত নয়, যারা যুক্তি-তর্কের ঘোর বিরোধী—সেই সকল পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলা। প্রকৃত জ্ঞানী বা পণ্ডিত তারাই, যারা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সত্যের পথে এগিয়ে যায়।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা মাধ্যম মোটেই এর সহযোগী নয়। উপরন্তু এ ব্যবস্থা গোঁড়ামীদের ভাবনা-চিন্তাকে আরো পরিপুষ্ট করে। এদের সবাই জলাভূমির মধ্যে নিমজ্জিত। এরা পংকিল আবর্তে হাবু-ডুবু খায়। অন্ধ বিশ্বাস, অযৌক্তিক চিন্তা-ধারা বিষাক্ত সাপের মতো তাদের মানসিকতাকে বিষময় করে রেখেছে।

আমাদের ধর্মীয় নেতাগণ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নেতৃবর্গ, পণ্ডিতদের থেকে আরো মারাত্মক। যদি পণ্ডিতেরা বলে এক হাজার বছর পিছিয়ে যাও, এরা বলবে সহস্র সহস্র বছর পিছিয়ে যাও, এমন কি কয়েক যুগ পিছিয়ে যেতে বলে। সহজ কথায়, উভয়ের কাছে যুক্তিবাদী মানসিকতার কোন ঠাঁই নেই। এরা সেই সমস্ত বিষয় সমর্থন করে—যা অমানবিক, অযৌক্তিক এবং বিবেক-বুদ্ধি রহিত।

পেরিয়ার বলেন : এই শ্রেণীর মানুষেরা কেবল মাত্র বর্বর বিশ্বের কথা তুলে ধরে। সুতরাং, এটা সহজেই অনুমেয় যে, একমাত্র অন্ধ ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই এই পণ্ডিত ও পাণ্ডাগণকে অনুসরণ করে চলে।

পেরিয়ার আরো বলেন : যাঁরা মনে করে যা কিছু পুরোনো, তাই স্বর্ণসম—এই দল কোন দিনই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে পারবে না। আত্ম-সম্মান আন্দোলন তো দূর কি বাত এবং পরিবর্তনের সুফলও ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু, যারা যুক্তিবাদী, তারা পুরোনো ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে না। যেটুকু ভাল, তা গৃহীত হয় এবং নতুন-পুরোনো মিশিয়ে পরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করে। এ পরিবর্তনকে সুস্বাগতম্ জানানোর জন্যে মানুষকে উৎসাহিত,

জাগরিত ও গ্রহণীয় করে তুলে যুক্তিবাদীদের লাগাতার প্রচার-প্রসার চালিয়ে যেতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা অন্ধ ব্যবস্থার বদলে নতুন ব্যবস্থার পত্তন করতে সক্ষম হবো। যদি এ কাজ নিরলসভাবে না করা হয়, তাহলে সমাজ ও দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

পৃথিবীর অন্যত্র মানুষ পুরোনো ভাবধারাকে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা তা বর্জন করেছে। তারা এক নতুন পৃথিবী চাইলো। সেই নতুন পৃথিবী হচ্ছে—অগ্রগতি, পরিবর্তন এবং উন্নতিই হবে যার মূলধারা। তারা নিরপেক্ষ চিন্তাধারার পক্ষে এবং একমাত্র এ কারণেই তারা অত্যাশ্চর্য বিষয় উদ্ভাবন করতে পেরেছিল। এই উদ্ভাবনের সুফল সারা বিশ্বের মানুষই ভোগ করছে।

সুতরাং, একমাত্র **দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষেরাই** এ সকল বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং উপলব্ধি করতে পারে যে, কয়েক শতাব্দী পর পৃথিবীতে কি কি পরিবর্তন আসছে এবং তার পরিণাম কি হতে পারে।

অতীতের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এবং ঐতিহাসিকগণের মতামত থেকে অনুমান করা যায় যে, আগামী দিনে এ বিশ্বে কোন রাজতন্ত্র থাকবে না। মূল্যবান সোনা-দানা শুধুমাত্র ভাগ্যবান কয়েকজনের একচেটিয়া অধিকারে থাকবে না। এ রকম রাজত্বে রাজশাসনেরও কোন প্রয়োজন নেই। আজ যে রকম বিধি-নিষেধ আছে, সে সব কিছুই থাকবে না। মানুষের জীবন, জীবন-ধারা ও অন্যান্য সব কিছুরই পরিবর্তন হবে।

আজ কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। এ পরিশ্রমের সময়কাল অনেক ক্ষেত্রে এত দীর্ঘ যে, সেটির তুলনায় পরিশ্রমের ফলভোগ করার সময় অত্যন্ত সামান্য। হয়তো খাদ্য-শস্য এবং ভোগ্যপণ্য বিশেষতঃ বিলাস বহুল ভোগ্যপণ্য যথেষ্ট মজুত আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যের যোগান কম থাকায় তুলনামূলকভাবে বহু মানুষকে অভুক্ত থাকতে হয়। সাধারণের জীবিকা নির্বাহের জন্যে তা অপ্রতুল। খাদ্যাভাবে তাদের চলমান জীবন সাধ-আহ্লাদহীন। এতদ্‌সত্ত্বেও, যদিও বা, আত্মনির্ভরতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, তথাপি এ সুবিধাগুলি খুব কম লোকে ভোগ করতে পারে। উৎপাদনের জন্যে কাঁচামাল ও তার সদ্ব্যবহারের পন্থা-পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে, তথাপি বহু লোক শুধুমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদানের ওপর জীবন-ধারণ করে থাকে। সমাজে বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম ও অবিচ্ছেদ্য

প্রয়োজনীয় সামগ্রীও বহু লোকের নেই। প্রকৃত অর্থে, এরা বঞ্চিত এবং অতি দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এ দেশে জমির অভাব নেই, কিন্তু বহু মানুষ ভূমিহীন। পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে—সুখময় জীবন-যাপনের সমস্ত উপাদান বিদ্যমান। তথাপি আমাদের মানুষ অনাহার, দারিদ্রতা, দুঃখ-কষ্ট ও বাঁচা-বাড়ার জন্যে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। এর পেছনেও কি ভগবানের সম্পর্ক রয়েছে? এ সব কিছুর পেছনে কি মানুষের সম্পর্ক নেই?

অনেকেই বলে থাকেন—এর পেছনে ভগবানের হাত রয়েছে। অথচ, অন্য উন্নত দেশবাসী কিন্তু এর জন্যে ভগবানকে দায়ী করে না।

তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এ কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমাদের মানুষের লড়াই করার **সৎসাহস, সামর্থ্য** ও **বুদ্ধি-মত্তা** নেই।

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষই সেরা ও বুদ্ধিমান। **মানব জাতিই ভগবান, ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকবাদের স্রষ্টা।**

অনেকে এটাও প্রচার করে যে, তারা সত্যি সত্যিই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আবার এটাও শোনা যায় যে, অনেকে ভগবানে একাত্মীভূত হয়ে গেছে।

পেরিয়ারের প্রশ্ন ঃ তাহলে, কেন এদের একজনও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও মূর্খতার সমাধান সূত্র দিতে পারেনি? এর কারণ একটাই যে, মানুষ এখনো অব্দি, দুনিয়াদারীর সাথে কোন সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা আত্ম-নির্ভর চিত্তে এখনো বিচার-বিবেচনা করতে শেখেনি।

ফলে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, **একমাত্র বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদী দার্শনিকেরাই মানব জাতির দুর্দশা লাঘবের জন্যে কিছু মঙ্গলময় কাজ করেছেন।** তাঁরা মানুষকে ভাল কিছু উপহার দিতে পেরেছেন এজন্যে যে, তারা নির্ভীকচিত্তে ভগবান ও ধর্মের থেকে নিজেদেরকে পৃথক রেখেছেন। তারা অন্ধবিশ্বাস ও দুরাশার পংকিল আবর্ত থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে গবেষণার কাজে মগ্ন হতেন এবং তার দ্বারা তারা অনেক কিছু আবিষ্কার ও নির্মাণ করতে সক্ষম হন। এর পরিণাম স্বরূপ, আজকের দুনিয়ায় **যুক্তিবাদ** অনেকখানি অগ্রসরমান। কিন্তু এর পরিচয় শুধুমাত্র পশ্চিম দেশেই পাওয়া যায়। তাদের দ্বারাই এ পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। তারা ভবিষ্যত পৃথিবীর পরিবর্তিত রূপদানের জন্যে সদা সচেষ্ট।

পেরিয়ারের প্রশ্ন ঃ আমরা কেন জন্ম নিলাম? কেন কিছু মানুষকে উদর পূরণের জন্যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হবে? বিশেষতঃ যেখানে পৃথিবী এত শস্য-শ্যামলায় পরিপুষ্ট, সেখানে বাঁচা-বাড়ার জন্যে এত জীবন-সংগ্রাম কেন? কেন মানুষকে অনাহারে, রোগে শোকে অল্প বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে?

অতীতে মানুষ ইশ্বরের গোপন হাত আছে বলে নিজেকে ভাগ্যের ওপর সঁপে দিত। কিন্তু বর্তমান যুগে, ব্যাপারটা ভিন্ন ধরনের। বিষয়টা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বজায় থাকলে একদিন শোষিত ও নিপীড়িত জনসমষ্টির ক্ষোভ থেকে সমাজে শুধুমাত্র সংস্কারই নয়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

এ রকম পরিস্থিতি আজ ভারতবর্ষে আসন্ন এবং তার জন্যে অর্থেরও বড় একটা প্রয়োজন হবে না। কাউকে কঠোর পরিশ্রমেরও প্রয়োজন থাকবে না। কোন কাজকে ছোট-বড় বা ঘৃণার চোখে দেখা হবে না। কোন কাজের জন্যে কাউকে হেয় বা ঘৃণা করা হবে না। সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে অর্পিত করা হবে। যেমন আজ দেয়া হয়েছে। দাসত্ব প্রথা ও অস্পৃশ্যতা নির্মূল হয়ে যাবে। জাতি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটবে। কাউকে অন্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে না। মহিলা সমাজের বিশেষ নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার কথা ভাবতে হবে না।

যে নতুন পৃথিবী আসছে তাতে একজন ব্যক্তিকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের জন্যে অল্প আয়াসেই দিন কাটানো সম্ভব হবে। যেমনটা আজ একজন মহাত্মা, জমিদার, সংঘাধিপতি বা ব্রাহ্মণ করে থাকে। একে অপরের দুঃখ-কষ্ট ও সুখ ভাগাভাগি করে নেয়া হবে। একতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠবে আগামী দিনের নতুন সমাজ ব্যবস্থা।

যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে। প্রাণঘাতী লুঠ-তরাজ ও খুন-খারাবি প্রায় থাকবে না বল্লেই চলে। বেকারী থাকবে না। দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী, সুদৃশ্য বস্তু বা স্থান—সব কিছুই সকলের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। কোন সুদখোর, ব্যক্তি-মালিকানার ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগ ইত্যাদি থাকবে না। দালাল, প্রতিনিধি ও অনুরূপ পরগাছা সম্প্রদায় এবং মুনাফালোভী গোষ্ঠী বলে কিছু থাকবে না। কোন সমর সজ্জার প্রয়োজন থাকবে না। নতুন

নতুন গবেষণার ফলে মানুষ দীর্ঘজীবি হবে। জনসংখ্যারোধে পদক্ষেপ যেমন নেয়া হবে, তেমনি তা বৃদ্ধিতেও খাদ্যাভাব থাকবে না। সমাজ অগ্রগতির পথে হাঁটতে থাকবে। সমাজের বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও প্রগতিবাদীদের গবেষণার সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এখানে বেতন বড় নয়, মনের খোরাক মেধাই বড় হয়ে উঠবে। মুনাফা এখানে কোন ফ্যাক্টর হবে না।

নতুন প্রজন্মের শিশুরা প্রবীনদের দেখে আরো মহান কিছু করার কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে।

অনেকে বলেন যে, এর ফলে অনেকে অলস হয়ে পড়বে, আসলে নতুন পৃথিবীতে অলস থাকাটা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অনেকে প্রশ্ন করবেন যে, তাহলে নীচ বা ঘৃণ্য কাজ কারা করবে? নতুন পৃথিবীতে সব কাজের সমমূল্য হবে। কারণ, সব কাজ মেশিনের সাহায্যে হবে। শুধুমাত্র মেশিন চালানোর কায়দা-কানুন শিখতে হবে। কোন কাজই অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হবে না। প্রত্যেক কাজের সেরাকে সম্মানিত করা হবে। (বর্তমানে কম্পিউটার হচ্ছে সেই মেশিন)।

ব্যক্তিগত মুনাফার রাস্তা বন্ধ হলে চরিত্রবান ও আত্ম-সম্মান বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ থাকবে না। সকল মানুষ নীতি-পরায়ণ ও সুসভ্য সমাজের অধিকারী হবে। যে সমাজে উচ্চ-নীচ, জাতিগত ভেদাভেদ, বঞ্চনা, রাজনৈতিক শোষণ প্রভৃতি বজায় থাকে—সে সমাজে ঘৃণা ও হিংসা-দ্বেষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। নতুন পৃথিবীর সমাজ ও দেশে শান্তি ছাড়া কিছু থাকবে না। গঙ্গাতীরে বসবাস করা মানুষের জল চুরি করতে হয় না। কোন পরিবারে উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্য মজুত থাকলে চুরি করার প্রবণতা কমে যায়। অনুরূপভাবে, মিথ্যা ভাষণ ও মিথ্যাচারের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কারণ, এতে কোন লাভ হবে না, বরং ঘৃণার পাত্র হতে হবে। এ সমস্ত কারণে, মদ্যপানেও কোন ক্ষতি হবে না। খুন-খারাবির কোন প্রয়োজন থাকবে না। জুয়া, বেটিং শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্যেই জারি থাকবে, কারণ এতে আর্থিক কোন লাভ থাকবে না। আর্থিক কারণে যে বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত, তারও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

এ **আত্ম-সম্মান বোধ সমাজে** কেউ কারো অধীনস্থ হবে না। কাউকে কোন লাভের আশায় মাথা নোয়াতে হবে না। যৌন জীবন সম্পর্কে মানুষ আরো প্রগতিশীল হয়ে উঠবে। হৃদয় দিয়ে হৃদয় মিলনের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হবে নতুন

ও সুন্দর আলোকিত জীবন। মানুষ জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সম্যক ধারণা পোষণ করবে। তারা শুধুমাত্র নীরোগ স্বাস্থ্যের প্রতি মনোনিবেশ করবে। মানুষ **আত্ম-সম্মান** নিয়ে আগামী দিনের কথা ভাববে। নারী-পুরুষ সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রেম-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কারো প্রতি বল-প্রয়োগের প্রয়োজন থাকবে না। সেখানে নারীর প্রতি পুরুষের বল-প্রয়োগ থাকবে না, সে সমাজে দেহ-ব্যবসারও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

পেরিয়ার একথাও বলেন—এ ব্যবস্থায় হয়তো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের সুস্থ্য করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে সেটা তখনই প্রয়োজন হবে—যখন রোগী অন্যদের কাছে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নারী বা পুরুষ কারো ওপর কোন বিধিনিষেধ থাকবে না। কারণ প্রত্যেকের ভাল-মন্দের বিচার-ক্ষমতা তৈরি হয়ে যাবে। মানুষ দ্রুতগামী যানে চলাচল করবে। ওয়ারলেসে কথা-বার্তা বলবে, টেলিভিশন সকলের আয়ত্বের মধ্যে এসে যাবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা সহজেই সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া যাবে। একটা মাত্র ক্যাপসুলে সারা সপ্তাহের পুষ্টি সাধন করা সম্ভব হবে।

যৌন সংগম ছাড়াই সন্তান উৎপাদন সম্ভব হবে। যেমন প্রাণীজগতে বীর্য সংগ্রহ করে প্রজনন করানো হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হবে। ফলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জন সংখ্যার হ্রাস পেলে, তা পূরণ করা সম্ভব হবে।

যে সমস্ত জিনিস আজ ব্যবহৃত হচ্ছে, তার আমূল পরিবর্তন হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আজকের অটোমোবাইলের ওজন অনেক গুণ কমে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রাইভেট বা ছোট গাড়ীর মোটর বিদ্যুৎ, ব্যাটারী বা সৌর বিদ্যুতে চলবে। বিদ্যুৎ প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন হবে। অতি দ্রুতগতিতে বিজ্ঞান এগিয়ে যাবে এবং আরো নতুন নতুন আবিষ্কার হবে।

পেরিয়ার নতুন পৃথিবী সম্পর্কে যে **ভবিষ্যত বাণী** করেছিলেন তার বেশির ভাগটাই আজ বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কোন ব্যক্তি একজনের আবিষ্কার অন্যের নামে চালাতে সক্ষম হবে না। সরকারের ওপর যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়ীত্ব থাকে—আগামী দিনে সে সবের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসবে।

পেরিয়ার আরো বলেন—আপনি ভগবানকে জানতে চান? নিজের থেকে ভগবানের কথা কারো কখনো মনে পড়ে না। এটা বাল্যাবস্থা থেকে বড়রা তাকে শিখাতে থাকে। নতুন পৃথিবীতে ভগবানকে দেখা বা খোঁজার কেউ থাকবে না। কারো যদিও বা ভুলবশতঃ মনে পড়ে যায়। পরক্ষণে সে তা ভুলে যাবে—যদি না তার কোন আশু প্রয়োজন না থাকে।

বুদ্ধের কথায় : **Know thyself, অর্থাৎ নিজেকে জানো**। নিজেকে জানতে হলে ভগবানের কোন প্রয়োজন হয় না।

পেরিয়ার বলেন—যদি কেউ এই পৃথিবীটাকে স্বর্গ মনে করে, তবে সে জগৎ সংসারকে সেভাবেই সাজিয়ে তোলে। তখন তাকে ওপরে 'স্বর্গ' এবং নীচে 'পাতাল' আছে বলে ভাবতে হয় না।

পেরিয়ারের প্রশ্ন ঃ সাধারণতঃ একজন মানুষ কেন ভগবানে বিশ্বাসী হয়? এর প্রধান কারণ হলো— সে নিশ্চিতভাবে কোন ঘটনা বা বিষয়ের কারণ বুঝতে অক্ষম হয়। খুব সহজেই যারা বিশ্বাস করে ফেলে, তারা সরলমনা এবং বুদ্ধিহীন। তারা ভাবে, এটা ভগবানের কাজ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন বা পুরোনো বিষয়ের কারণ খোঁজেন এবং উপলব্ধি করেন। স্বাভাবিক ভাবেই তারা ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হয় না।

সুতরাং আজকের দিনে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া অবশ্যই পরিবর্তিত হওয়া উচিত। এটাই বর্তমান যুগে জরুরী বিষয়। যদি কেউ কারণ অনুসন্ধান না করে, তবে তাকে অজ্ঞাত অন্ধকারে ডুবে থাকতে হবে এবং সেই অন্ধকার থেকে আলোকে পৌঁছাবার জন্যে **ভগবান** নামক কাল্পনিক শক্তির আশ্রয় নিতে হবে। নতুন বিশ্বের কাছে এ রকম অবস্থা মোটেই অনুকূল বলে বিবেচ্য নয়।

আগামী পৃথিবীতে কোন স্বর্গ-নরক থাকবে না। কারণ সেখানে মন্দ কাজ করার প্রবণতাই থাকবে না। কেউ অন্যের সাহায্যের জন্যে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। সুতরাং স্বর্গ বা নরক শব্দ দু'টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

সব কথার শেষ কথা হচ্ছে—এরকম একটা পৃথিবী কিন্তু হঠাৎ করে চলে আসবে না। ধীরে, ধীরে ধাপে ধাপে বহু প্রজন্মের ত্যাগ, সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা বাস্তবায়িত হবে। সমাজের কঠিন সমস্যাগুলি সমাধানের সূত্র খুঁজতে খুঁজতে এবং **আত্ম-সম্মানের** এই **সত্যকে আশ্রয়** করে (সত্যাশ্রয়ী কর্তৃক) অমৃত বাণী প্রচারিত হতে থাকবে। একদিন এই বিবর্তনবাদী ঝঞ্ঝা-ব্যাকুলতার মধ্যে নতুন

পথের দিশারী হিসাবে এক পথ-প্রদর্শকের আবির্ভাব ঘটবে—তাঁর প্রদর্শিত পথে নতুন বিশ্বের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সেই শুভ-ক্ষণে, "কেউ আর বলবে না, আমাদের কি করার আছে—সবই ভগবানের ইচ্ছা, সকল কার্য-কারণের মূলে ভগবান।"

আগামী পৃথিবীতে যত বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। সমস্যা আসবে এবং তা সমাধানের জন্যে সর্বদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কেউ যদি কোন জটিলতার সৃষ্টি করে, পরিবর্তন কামী মানুষেরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে ও সুচারুরূপে তৎক্ষণাৎ তার সমাধান করতে সক্ষম হবে। এর ফলে, **সুস্থ্য সমাজ-ব্যবস্থা** গড়ে উঠবে।

পরিশেষে, পেরিয়ার দৃঢ় চিত্তে বলেন—আজ অন্ধ বিশ্বাস, পুরোনো ধ্যান-ধারণা মানুষকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। যা দেশের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। স্বাভাবিক কারণে, এ স্বার্থন্বেষী কায়েমী স্বার্থবাদীরা, যাদের অন্তর-মন জ্ঞান বুদ্ধিহীন চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট, তারা কিছুতেই নতুন পৃথিবীর অগ্রগতিকে গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু আমার আত্ম-বিশ্বাস এই যে, যারা নির্ভীকচিত্তে মানুষের অজ্ঞতা দূরীকরণ এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখোশ খুলে দিয়ে অগ্রগতির অস্ত্রকে হাতিয়ার করবে—তারা সফল হবেই।

আসুন, আমরা একযোগে, ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন দিনের আগমনী বার্তাকে সুস্বাগতম জানাই। তরুণ যুবক—যুবতী এবং যুক্তিবাদীরা এগিয়ে আসুন। যুক্তিবাদী মনিষীগণের চিন্তাধারা ও মননশীলতাকে পাথেয় করে সম্মিলিতভাবে নতুন পৃথিবী ও নতুন সমাজ-ব্যবস্থা নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করি। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমৃত্যু আমার এ আত্ম-সম্মানের লড়াই চলবে।

মনুর কালা-কানুন

ঘৃণ্য মনু-সংহিতা গ্রন্থটি—দুটি বিদ্বেষ সূচক উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রচিত হয়েছিল। তার একটি হলো শারীরিক শ্রমহীনতা ব্যতীত নিজেদেরকে বাস করবার অধিকারী শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে ভারতে তথা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভারতের মূল অধিবাসীদিগকে কুলি, মজুর, গোলাম হিসাবে এবং ব্রাহ্মণদের হুকুম অনুযায়ী তাদের দাসবৃত্তি করার নিন্দিত নিকৃষ্ট মানুষ হিসাবে

পরিণত করা।

অপরটি হলো "যদি কখনও সরকার কর্তৃক এ আইন পাশ হয়ে যায়, তখন এই নিয়মগুলি এমন ভাবে আইনে পরিণত হবে এবং আদালতে এমনভাবে বিচার প্রয়োগ করা হবে, যাতে এ অসাম্য ও অবিচার চিরদিনের মত স্থায়ী অর্থাৎ সনাতন হয়। পেরিয়ার বলেছেন, সহস্র বছরের অধিক কাল যাবৎ মনুর নিয়মাবলী হিন্দু আইন কানুনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। মনুর নিয়মাবলী রক্ষা করার গর্বে গর্ব্বিত হতে শূদ্র রাজাদিগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে ভারতের মূল অধিবাসীগণের চিরস্থায়ী হীনমন্যতা ও শান্ত দাসত্বভাব সুনিশ্চিত করা হয়েছে। একেই বাবাসাহেব বলেন— "গোলামেরা গোলামী করে আনন্দ পায়।"

এমন কি ইংরেজ শাসন কাল পর্য্যন্ত অসামরিক অধিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্যও মনুর নিয়মাবলীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চিরকাল বজায় রাখার জন্য নিশ্চিত আশ্বাস পেতে ব্রাহ্মণগণ সফলকাম হয়েছিল। ধর্মীয় বিলের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অজুহাতে যে অসম আইন নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতি ঘৃণ্যভাব আনয়ন করেছিল, তাও শেষ পর্য্যন্ত পাশ করতে ইংরেজ সরকারকে রাজী করানো হয়েছিল। একমাত্র ফৌজদারি অর্থাৎ অপরাধমূলক আইন তৈরি করার ব্যাপারে তারা কিন্তু ব্রাহ্মণদের অন্যায় আবদার রক্ষা করেননি এবং ফৌজদারি আইন প্রয়ন কালে তারা তাদের পাশ্চাত্য দেশের গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ীই তা করেছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দুশ্চরিত্র জাতির হাতে শাসনভার থাকলে তো শূদ্রদের দুর্দশার আর অন্ত থাকতো না।

যে আইনে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থা থাকে, তা কি গণতান্ত্রিক? সে রকম আইন কি দেশে প্রচলিত থাকতে পারে? একে জনপালন আইন হিসাবে পরিগণতি হবার ন্যায্য মূলসূত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। তার জবাব কে দেবে? একই দেশের জনগণের জন্য অসম বিচার পরিবেশনকারী বিচারক ও আদালত কী করে দেশে টিকে থাকতে পারে? বিশ্বে এমন কোন দেশ আছে কী যেখানে বিদেশী অধিবাসীদের কাছে রক্ষিতার সন্তান বুঝাতে দেশের মূল অধিবাসীদের বুঝায়? শূদ্রদেরকে বুঝায়? মজদুর ও খেটে খাওয়া লোকদেরকে বুঝায়? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে হেয় করে এমন কি তাদেরই খরচায় অপরিমিতরূপে ক্ষুদ্র উচ্চবর্ণের সংখ্যালঘুদের অসৎ পথে পাওয়া সুখ-সুবিধার সংরক্ষণ ব্যবস্থা যে

দেশে থাকে তাকে কি কোন সভ্য দেশ বলে অভিহিত করা যেতে পারে! দেশের যুবকবৃন্দ যাতে চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে এ নারকীয় আইনের কাল গ্রাস হতে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করতে পারে সেজন্যে মনুর এ কালা কানুনে যে সমস্ত অন্যায়, অবিচার ও ঘৃণ্য নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান, তা ভারতের প্রত্যেকটি যুবককে জানাতে হবে।

মনু সংহিতার জন্ম ইতিহাস

অবহেলিত শূদ্রদের চোখে ধূলো দেয়ার জন্য দেশে অন্যায়, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা কায়েম করতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ঈশ্বর বা দেবতাকে প্রত্যেক কর্মে বা কর্মফলে সংযুক্ত করে থাকে। মনু সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ নং সূত্রে বলা হযেছে "সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা" মনু-স্মৃতি তৈরি করে প্রথমে তিনি ভৃগুমুনিকে বলেছিলেন। ভৃগুমুনি আবার তা রাজা মনুকে ও অন্যান্য শিষ্যকে বলেছিলেন। এর রচনা কাল দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে।

ব্রহ্মার চরিত্র

১। ভারতের মূলনিবাসীদের দেবতা শিব ও পার্বতীর বিবাহে আক্রমণকারী বিদেশী আর্য্যদের দলপতি ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নির চতুর্দিকে পরিক্রমাকালে পরিহিত বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের ভয়ে সরলমতী পার্ব্বতী বামহাত দিয়ে তার শড়ীর প্রান্তভাগ উঁচু করে ধরেন। কাছে বসে থাকা পুরোহিত ব্রহ্মা পার্বতীর অনাচ্ছাদিত উরু ভাগ দর্শন করেন। সাথে সাথে তিনি পার্বতীর সাথে কামোদ্দীপ্ত প্রেমে পতিত হন এবং তাহার শুক্র হোমাগ্নিতে পতিত হয়। তথা হতে অগস্ত্য মুনির জন্ম হয়।

২। ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ পার্বতীর উরুর দিকে তাকাবার সুযোগ পান এবং তার শুক্রও তৎসঙ্গে নির্গত হতে থাকে। সে শুক্র ভ্রচা পছাই এবং অন্যান্য চারাগাছের মূলমুখে নিক্ষিপ্ত হয়। তথা হতে ভল্কীলিয়তি ও অন্যান্য কিছু কিছু ঋষির জন্ম হয়।

৩। অতঃপর বিবাহ বাসর হতে ফিরে যাবার পথে কোন শ্মশানের ভস্মরাশির

ওপর তার কয়েক বিন্দু শুক্র পতিত হয়। ফলশ্রুতি হিসাবে পুরিকা নামক রাক্ষসের জন্ম।

৪। শশ্মানের আধপোড়া অস্থিসার সংগ্রহ করে, ব্রহ্মা সেগুলিকেও তার বীর্য্য দ্বারা সিক্ত করেন ও তা হতে বীর যোদ্ধা কুমার শাল্মীর জন্ম হয়।

৫। আরও কিছুদূর যেতে তার কিছু শুক্র মাটিতে পতিত হয় ও একটি পক্ষী কর্তৃক পীত হয় ও শকুনির জন্ম হয়।

৬। অতঃপরও যৎসামান্য শুক্র কোন ডোবাতে পতিত হলে, একটি মণ্ডুক তা গিলে ফেলে ও তা হতে মন্দোদরী নামে একটি কন্যার জন্ম হয়।

৭। শুক্রের শেষাংশ একটি জলাশয়ের পদ্মফুলে পতিত হলে তা হতে পদ্মা নামে একটি পরমা সুন্দরী তনয়ার জন্ম হয়।

৮। এই অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা পদ্মার রূপে বিমোহিত হয়ে ব্রহ্মা তার সাথে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে প্রস্তাব রাখেন। পদ্মা এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে, তাকে খুশী করার জন্য ব্রহ্মা নিম্নলিখিত বেদ শ্লোকটি আবৃত্তি করেন ঃ

"মাতারং উপেত্য স্বসারং উপৈতি পুভ্রার্থিনা
সঙ্গমার্থিনা অপত্যলোকং নাস্তি এতৎ।
পুত্রার্থং মাতারং সুরাণ যাতি রোহতি।"

৯। অতঃপর মিলনের সমর্থন জানানো হলে ও পদ্মা সন্তান সম্ভাবনা হলে, ব্রহ্মা ক্ষান্ত হলেন।

১০। ইন্দ্রের কামলীলার প্রত্যুত্তরে, তিলোত্তমা ভারতের চারি কোণে নৃত্য করেছিলেন। তাতে ব্রহ্মার চারটি মাথাই তিলোত্তমার সাথে সাথে উড্ডীয়মান অবস্থায় নৃত্য করেছিল। সেজন্য তার একটি পঞ্চম মুণ্ড সৃষ্ট হলো। তিলোত্তমার প্রতি তার গভীর প্রেম তাকে তার প্রতি ধাবিত করেছিল। সেজন্য ঈশ্বর তার একটি মুণ্ড ছেদন করে শাস্তি প্রদান করেন।

১১। অতঃপর ব্রহ্মা বনে বিচরণ কালীন একটি ভল্লুকীকে দেখতে পেয়ে তার সাথে কিছু কাল স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেন। তাতে ভল্লুকী জাম্বুবান নামে একটি সন্তান জন্ম দেয়।

১২। অতঃপর উর্বশী নামে এক নর্ত্তকীর সাথে বোঝাপড়ার পর ব্রহ্মা পূববর্তী প্রেমিকা পদ্মার কাছ হতে যে শুক্র রক্ষা করেছিলেন, তা উর্বশীর জরায়ুতে স্থাপন করেন। তা হতে বশিষ্ঠ মুনির জন্ম হয়। বশিষ্ঠের ওপর নিজের কর্মভার অর্পণ

করে ব্রহ্মা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এরূপ চরিত্রের একটি লম্পটকে হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেহেতু তিনি আর্য্যদের একচ্ছত্র অধীশ্বর। আর ব্রহ্মার জীবনের ঘটনাবলী হতে মনুর চরিত্রও প্রস্ফুটিত হয়।

পুরাণ অনুযায়ী বেদ রচনাকারী বিভিন্ন ঋষিদের জন্মের প্রকৃতি এতো কৌতুহল উদ্দীপক এ কারণে যে, তারা অত্যন্ত অশ্লীল, নোংরা, ঘৃণ্য এবং সাধারণ জ্ঞান দ্বারা অগ্রাহ্য।

পিতা বা মাতার নাম সহ এভাবে সৃষ্ট কিছু কিছু মুনি ঋষিদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

ঋষির নাম	পিতা/মাতা	ঋষির নাম	পিতা/মাতা
কালাই কোট	হরিণ	মাণ্ডব্য ঋষি	ভেক
জম্বুক ঋষি	খেকশিয়াল	মদঙ্গর "	মুচী
কৌশিক "	কুশঘাস	শাক্য "	পড়্যা
গৌতম "	ষণ্ড	কাঁকেয়া "	গর্দভ
বাল্মিকী "	শিকারী	শ্বাবুনক "	কুকুর (শ্বা)
অগস্ত্য "	পাতর	কানাড় "	পেঁচা
ব্যাসদেব "	জেলেনী	শুক "	চড়ুইপাখী
বশিষ্ঠ "	উর্বশী	জাম্বুবান "	ভল্লুকী
নারদ "	রজকিনী	অশ্বত্থামা "	ঘোটকী
কাদানা চাল্লী	বিধবা		

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার যে, ঋষিদের জন্ম সম্বন্ধে সভ্য সমাজ তো দূরের কথা, কোন অসভ্য বর্বর জাতীয় মানুষও এসব কাল্পনিক ও উদ্ভট কথা বিশ্বাস করবে না। হিম্মৎ থাকে তো এ সব শাস্ত্রের প্রবক্তাগণ হাতে কলমে দেখিয়ে দিক যে, কোন শিয়াল বা খাসবা পাখীর গর্ভে কোন মানব সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যে এসব উদ্ভট কথা বিশ্বাস করতেন, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, শাস্ত্র পাঠকগণ বাক্‌চাতুর্য্যে এতো পটু ছিল যে, সেসব অজ্ঞ সংস্কারাপন্ন ও সরল প্রকৃতির লোকেরা তাদের কথায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে যেতো।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভগবান বিষ্ণু এবং ভগবান শিব স্বামী-স্ত্রী রূপে

বাস করলেন এবং তাদের সন্তানও একজন দেবতা। বিষ্ণু নারদের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন এবং তাহাদের ষষ্ঠ সংখ্যক সন্তান হয়েছিলো। (এরা সমকামী ছিল)

মহাবিষ্ণুর স্বর্গীয় স্ত্রী লক্ষ্মী নাকি একটি সুদর্শন ঘোটকের সাথে প্রেমে পড়েন ও তার সাথে মিলনের চেষ্টা করেন। মহাবিষ্ণু এটা দেখতে পেয়ে স্বয়ং ঘোটক রূপ ধারণ করলেন ও লক্ষ্মীদেবীকে ঘোটকী করে মিথুনানন্দ উপভোগ করান। এবং একবীর নামে পুত্রের জন্ম হয়।

ইন্দ্র পরিসাথন রাজার ফুটফুটে সুন্দরী স্ত্রীর সাথে প্রেমাবদ্ধ হয়, কিন্তু মহিলাকে প্রলুব্ধ করতে অসমর্থ হয়ে সুযোগের সন্ধান করতে থাকেন। পরবর্তী কালে রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সময়ে নিয়মানুযায়ী যজ্ঞাশ্বের লিঙ্গ রাণীর গোপন অঙ্গে প্রবিষ্ট করানোর কথা। এ সুযোগে ইন্দ্র অশ্বের লিঙ্গে প্রবেশ করেন এবং অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সাথে তার মনস্কামনা পরিপূর্ণ করেন। ইন্দ্রের এসব কামুকতা সম্বন্ধে আরও অনেক, অনেক উপাখ্যান আছে, যেগুলি এতো অশ্লীলতায় ভরপুর যে, তা এখানে আর বিবৃত করা অসম্ভব।

যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের কালা আইন কানুন মানুষকে অনুসরণ করতে বলা হয়, সে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে কিছু কিছু পৌরাণিক ঘটনা এখানে বিবৃত করা হলো। এ সমস্ত হীন এবং লম্পট ব্যক্তিগণকে মানুষের কাছে দেবতা রূপে প্রতিফলিত করা হচ্ছে এবং তাদের রচিত আইন দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের ধর্মাধিকরণ কর্তৃক আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। মনুস্মৃতির কতকগুলি উদ্ধৃতি নিম্নে লিখিত হলো ঃ—

মনু সংহিতার উদ্ধৃতি

১. "ব্রহ্মা মনু ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছিলেন এবং মহর্ষি ভৃগুর কাছে তা ব্যক্ত করেছিলেন। অধ্যা ১—শ্লোক ৫৯

২. যেহেতু জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রথম, তাই সে অন্যান্য বর্ণের মানুষ হতে দান গ্রহণ করে ঐশ্বর্য্যশালী হতে পারে। (১/১০০)

৩. কোন ব্রাহ্মণ যখন দান গ্রহণ করে, তখন সে নিজের বস্তুই গ্রহণ করে। কেন না, জগতের সকল বস্তুই ব্রাহ্মণের। অপরেরা সে বস্তু ব্রাহ্মণের মহানুভবতায় ভোগ করে। ১/১০১

৪. অপর বর্ণের মানুষের কাছে কোন ব্রাহ্মণ কখনই মনুশাস্ত্র শোনাবে না। ১/১০৩।

৫. যজ্ঞকারীদের বস্তুসমূহ দেবতাদের বস্তু। অযজ্ঞকারীদের বস্তু সমূহ অসুরদিগের বস্তু। অসুরদিগের বস্তু সমূহ সুরদিগের বস্তুরূপে পরিণত করা ধর্মের একটি অঙ্গ। ১/১২০

৬. শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য সম্বন্ধে প্রশ্নকারী নাস্তিক। ২/১০

৭. যে নাস্তিক বেদসমূহের নিন্দা করে, সে ঈশ্বরের নিন্দা করে। ২/১১

৮. ব্রাহ্মণ, নাবালক হোক আর অবিদ্বানই হোক, একজন বড় দেবতা। ৯/৩১৭

৯. "কোন শূদ্র যদি রাস্তার কোন ব্রাহ্মণ-স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তার গোপন অঙ্গ ছেদন পূর্বক তাকে শাস্তি দেয়া হবে।"

১০. "কোন শূদ্র যদি কোন রক্ষিতা ব্রাহ্মণ নারীর সাথে মিলিত হয় তাকে টুকরো টুকরো করে কাটা হবে এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।" অ/৮-৩৭৪

১১. "শূদ্র কর্তৃক শাসিত দেশ বিনষ্ট হবে।" অ/৮-২১

১২. "যে দেশের অধিকাংশ লোক শূদ্র, নাস্তিক এবং অব্রাহ্মণ, তা দারিদ্র ও রোগ দ্বারা পীড়িত হবে এবং যথাকালে বিনষ্ট হবে।" অ/৮-২২

১৩. "শূদ্র কোন দিনও ব্রাহ্মণের বিচার কর্তা হতে পারবে না।" অ/৮-২০

১৪. "শূদ্র সত্য কথা বলেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে তাকে তপ্ত লৌহদণ্ড তুলতে বা জলে ডুবতে বলা হবে।" ৮-১১৪

১৫. "শূদ্রের তাতে যদি হস্ত না পোড়ে অথবা সে জলে ভাসতে থাকে, একমাত্র তখনই তার জবানবন্দী সত্য বলে গৃহীত হবে।" অ/৮-১১৫

১৬. "ব্রাহ্মণ যদি দুর্বলও হয়, তাকে বিদ্রূপ করা চলবে না।" অ/৪-১২৫

১৭. "যে লোক ব্রাহ্মণের সাথে শত্রুতা করে সে বিনষ্ট হবে।" ৪-১৩৫

১৮. "যে ব্যক্তি শ্রুতি ও স্মৃতিকে অশ্রদ্ধা করে এবং নিজের জাতি ব্যবসা ছাড়া অন্য কর্ম করে, রাজা তাকে দেশ হতে বহিষ্কার করবে।" অ/৯-১২৫

১৯. "রাজা শূদ্রকে তার নিজস্ব বৃত্তি অবলম্বন করতে হুকুম জারি করবে।" অ/৮-৪১৮

২০. প্রত্যেক জাতির জন্য যে ধর্মের ব্যবস্থা করা আছে, তা পবিত্র বেদ অনুযায়ী। অ/২-৭

২১. জনগণ যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন না করে, তাহলে ব্রাহ্মণ অস্ত্র ধারণ করতে পারে। অ/৮-৩৪৮ (বৃহদ্রথকে হত্যার সময় ব্রাহ্মণ ১ম অস্ত্র ধারণ করে)।

২২. নারী হত্যা ও অব্রাহ্মণ বধ পাপ নয়। অ-১১-৬৬

২৩. শূদ্র কর্তৃক শাসিত রাজ্যে, বা যে রাজ্যে চণ্ডালাধিক্য, সেথায় উচ্চতর জনগণের বাস করা উচিত নয়। অ/৪-৬১

২৪. একজন শূদ্র রাজা দশ সহস্র কসাই-এর সমান। অ/৪-৮৬

২৫. মনু ধর্ম-শাস্ত্রানুযায়ী যে রাজা শাসন চালায় না, তাকে তার নিজের অস্ত্র দ্বারাই হত্যা করা যেতে পারে। অ/৭-২৬

২৬. কোন সভায় শূদ্র কোন প্রস্তাব রাখবে না। অ/৮-২০

২৭. রাজার ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য ক'রে, ব্রাহ্মণ তা আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা শূদ্রদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অ/১১-৩২

২৮. শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের চুল, দাঁড়ি, গোঁফ, টেংরী, ঘাড় কিম্বা কোন গোপন অঙ্গে হাত দেয়, তার হাত কেটে ফেলা হবে। অ/৮-২৭২

২৯. শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সাথে একই আসনে বসে, তার কোমরে গরম লোহার দাগ দিয়ে দেয়া হবে, কিম্বা তাকে দেশান্তরিত করা হবে। অ/৮-২৮১

৩০. শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে যষ্টি দ্বারা বা হস্তদ্বারা আক্রমণ করে, তাহলে যে অঙ্গ দিয়ে আঘাত করেছে, সে অঙ্গ ছেদন করা হবে। অ/৯-২৮০

৩১. শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের বেশ—যেমন, উপবীত-ধারণ করে, তাহলে রাজা তার অঙ্গ ছেদন করবে। অ/৯-২২৪

৩২. যে শূদ্র ব্রাহ্মণের কোন সম্পত্তি নিয়ে যায়, তাকে পীড়ন করে হত্যা করা হবে। অ/৮-২২৮

৩৩. উচ্চবর্ণের লোকের কর্ম্মে রত শূদ্রকে তার সম্পত্তি হতে বিচ্যুত করা হবে ও রাজা কর্তৃক দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে হবে। অ/১০-৯৬

৩৪. ব্রাহ্মণের যত গুরুতর অপরাধই হোক, তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। অ/৮-৩৮৯

৩৫. হত্যা সহ ব্রাহ্মণের যে কোন অপরাধই হোক, বড়জোর তার মস্তক

কামিয়ে দেয়া হবে। এ রকম অপরাধ আর যে কোন বর্ণের লোকই করুক, তার মৃতুদণ্ড হবে। অ/৮-৩৭৯

৩৬. ব্রাহ্মণ যদি সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ করে, তাকে তার সম্পত্তি দিয়ে দেশান্তরী করা হবে। অ/৮-৩৭৯

৩৭. যজ্ঞ বা পূজার জন্য ব্রাহ্মণ যদি চুরি করে, রাজা তাকে কোন শাস্তি দেবে না। রাজার অজ্ঞতার জন্য যদি ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট পায়। সে রাজ্যের অকল্যাণ হবে। অ/৩-১৩০

৩৮. যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না সে অসুর। তার সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হ'লে তা ধর্মের বিরোধী নয়। অ/৭-২৪৮

৩৯. নারী বা শূদ্র কর্ত্তৃক অর্জিত সম্পত্তি পরিবারের কর্তা ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। অর্জনকারীর এতে কোন অধিকার নেই। অ/৮-৪১৬

৪০. কোন দাস বা শূদ্রের কোন সম্পত্তি করার অধিকার নেই। ব্রাহ্মণ বিনা দ্বিধায় তার সম্পত্তি দখল করতে পারে। অ/৮-৪১৭

৪১. একজন শূদ্র যতবড় যোগ্যতাসম্পন্ন হোক না কেন, তার কোন সম্পত্তি থাকবে না। শূদ্রের সম্পদ মানে ব্রাহ্মণের দুঃখ ও যাতনা। অ/১০-১২৯

৪২. একজন ধনী শূদ্রকে তার সম্পত্তি হতে বলপূর্বক বঞ্চিত করা যেতে পারে। অ/১১-১৩

৪৩. ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অসত্য বলা অন্যায় নয়। অ/৮-১১২

৪৪. কোন অব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। তাহ'লে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রহৃত করা হবে। অ/৮-৩৫৯

৪৫. নীচ জাতির কোন বিবাহিত মানুষ যদি উচ্চ বর্ণের কোন অবিবাহিত কন্যার সঙ্গে বা কোন অবিবাহিত শূদ্র যদি বিবাহিত উচ্চবর্ণের রমনীর সঙ্গে মিলিত হয়, তাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করে মেরে ফেলা হ'বে। অ/৮-৩৬৬

৪৬. স্মৃতি ও শ্রুতির আইন ভঙ্গকারী শূদ্রকে মাথায় উকুন ভক্ষণকারী ভূত বলে মনে করতে হবে। অ-১২-৭২

সাত রকমের শূদ্র আছে ঃ—

১। রণক্ষেত্র হতে পলাতক।

২। যুদ্ধ বন্দী।

৩। ব্রাহ্মণ ভক্তি সহকারে সেবাকারী।

৪। বেশ্যার পুত্র।

৫। ক্রীত দাস।

৬। দত্তক।

৭। বংশগত দাস বৃত্তিক। সকলেরই অধ্যায় ৮/৪১৫

৪৭. ব্রাহ্মণদেরকে পূজা না করার জন্য ও উপনয়ন না-গ্রহণের জন্য, ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অ/১০-৪৩

৪৮. শূদ্রের জীবন ধারণের জন্য ব্রাহ্মণ তার ছিন্ন বস্ত্র, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ এবং বিস্বাদু শস্য দিতে পারে। অ/১০-১২৫

৪৯. ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রাণীর গর্ভজাত সন্তানের সম্পত্তিতে শূদ্রের কোন অধিকার নাই। পৃথিবীতে বাস করার জন্য এবং পরজন্মে লাভবান হবার জন্য শূদ্র সদাই ব্রাহ্মণের সেবা করবে। অ/১০-১২২

৫০. একমাত্র ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রকে এজন্মে ও পরজন্মে লাভবান করবে। অ/৯-৩৩৪

৫১. চিন্তায়, কথায় ও কর্মে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করবে। অ/৯-৩৩৫

৫২. ব্রাহ্মণকে সেবার জন্য শূদ্রকে আদেশ করা রাজার কর্তব্য। শূদ্র যদি আদেশ অমান্য করে, রাজা তার অঙ্গচ্ছেদ করে তাকে শাস্তি দান করবেন। অ/৮-৪১০

৫৩. ব্রাহ্মণ কর্তৃক কর্ম গ্রহণ করলে পারিশ্রমিক দিতেও পারে নাও দিতে পারে। ব্রাহ্মণকে সেবার জন্যই ব্রহ্মা কর্তৃক শূদ্র সৃষ্ট হয়েছে। অ/৮-৪১৩

৫৪. যে ব্রাহ্মণের সেবা করে না, সে শূদ্রই। শূদ্র জন্মগত ভাবেই দাস। শূকর ছানার গন্ধে, কুকুরে দৃষ্টিতে এবং শূদ্রের স্পর্শে খাদ্য কলুষিত হয়। অ/৩-২৫১

৫৫. শূদ্র ব্রাহ্মণকে গালি দিলে, তার জিহ্বা কেটে ফেলা হবে। অ/৮-২৭০

৫৬. যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণের নাম, জাতি ইত্যাদি উল্লেখ করে ব্রাহ্মণকে গালাগালি করে, তার মুখ দশ ইঞ্চি লম্বা তপ্ত লাল ডুগডুগে লোহার শিক দ্বারা দাগিয়ে দেয়া হবে। অ/৮-২৭১

৫৭. কোন শূদ্র ব্রাহ্মণকে কোন কর্ম করতে আদেশ করলে, তার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল ঢেলে দিবে। অ/৮-২৭২

৫৮. একজন ব্রাহ্মণ নীচ কর্মে লিপ্ত হলেও পূজা করার অধিকারী কারণ সে উচ্চ বর্ণের। অ/৯-৩১৮

৫৯. যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাজ করে সেও উচ্চবর্ণ। অ/১০-৭৫

৬০. আপৎ কালে একজন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অন্ন ভোজন করলেও পাপ হয় না। অ/১০-১০৪

৬১. ব্রাহ্মণ এমন গ্রামে বাস করবে, যেথায় শূদ্রগণ মজুর বা দাস হতে অধিক কিছু নয়। অ/২-২৪

৬২. ব্রাহ্মণকে দেয়া নাম পূণ্য বুঝাবে, শূদ্রকে দেয়া নাম হীনতা বুঝাবে। অ/২৩১

৬৩. একজন শূদ্রের নামের দ্বিতীয় অংশ হবে "দাস"। অ/২-৩২

৬৪. ময়দা, দুধ, ডিম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি নরম খাদ্য, মিষ্ট রস, কন্দ, আলু, ওল জাতীয় খাদ্য, গোমাংস, টাটকা জল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ভুক্ত হতে পারে। অ-৩-২২৭

৬৫. মন্ত্রপুত জন্তুর মাংস ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হতে পারে। অ-৫-২৭

৬৬. জীবন সংশয়ের সময় জন্তুর কাঁচা মাংস খেলেও ব্রাহ্মণের পাপ হবে না। অ-৫-৩০

৬৭. মৃত ব্যক্তিদের আত্মার তৃপ্তির জন্য শাস্ত্র জন্তুর মাংস উৎসর্গের ব্যবস্থা দিয়েছে—তা শ্রাদ্ধকালে ব্যবহৃত হতে পারে। সেই তৃপ্তি কোন মাংসে কত দিন চলবে তাও নিরুপিত হয়েছে! মনু ধর্ম শাস্ত্রে উল্লিখিত বিবরণের কিছু কিছু নিম্নে দেয়া হলো ঃ—

কোন জন্তুর কাঁচা মাংস	কতদিন তৃপ্তি দেবে	অধ্যায়	সূত্র
গুগলি, লাল চাউল, থোগার ডাল, জল এবং কন্দ, আলু ইত্যাদি	এক মাস	৩	২৬৭
কচ্ছপ, মৎস্য	দুই মাস	"	ঐ
হরিণ	তিন মাস	"	ঐ
মেষ	চার মাস	"	ঐ

কোন জন্তুর কাঁচা মাংস	কতদিন তৃপ্তি দেবে	অধ্যায়	সূত্র
পক্ষী	পাঁচ মাস	”	২৬৯
অজ	ছয় মাস	”	ঐ
বিচিত্র হরিণ	সাত মাস	”	ঐ
ডোরা কাটা মৃগ	আট মাস	”	ঐ
শৃঙ্গী মৃগ	নয় মাস	”	ঐ
সজারু ও বন্য মহিষ	দশ মাস	”	২৭০
শশক ও কর্ম	এগার মাস	”	ঐ
গো দুগ্ধ, দধি, ঘৃণ	বার বাস	”	২৭১
জল পান করার সময় কর্ণদ্বয় জলস্পর্শ করে এমন বৃদ্ধ ছাগ	বার মাস	”	ঐ
অমৃত, মেষ, বন্য লাল চাউল	চিরদিন	”	ঐ
বিশেষ হাড় যুক্ত মাংস	”	”	ঐ

যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোৎসর্গীকৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করতে অসমর্থ, সে ব্রাহ্মণের ২১ বার গাভী জন্ম হবে। অ-ক শ্লোক ৩৫

শ্রাদ্ধের দিন শূদ্রকে বাড়ী হ'তে বিতাড়িত করবে। ৩-২৪২

শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের সেবা তপস্যা সম। অ-১১-২৩৫

উপসংহার : পরিশেষে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পেরিয়ার রামস্বামী নাইকারের "আত্মসম্মান আন্দোলন" ছিল এ দেশের বঞ্চিত জনতা তথা মূলনিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি ও রাজনৈতিকভাবে সার্বিক মুক্তির এক বৈপ্লবিক আন্দোলন। যারা এ মুক্তির আন্দোলনে নিজেরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের অবশ্যই পেরিয়ারের এ আত্মসম্মান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর হতে হবে। কারণ, আত্মসম্মান বোধ জাগরিত না হলে সমাজ পরিবর্তনের আশা সুদূর-পরাহত।

—ঃ——ঃ—

SSPT-4

ASASRI

(ASSOCIATION OF SOCIAL ALTERATION & SOCIAL REVOLUTION OF INDIA)

শান্তি সত্যভামা পাবলিকেশান ট্রাস্ট

Email ID : asasri 2017@gmail.com
Visit at : www.facebook.com